ছোটদের

ভালো ভালো গল্প

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীপ্রকাশ ভবন
এ ৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট • কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১

প্রকাশিকা
শুক্লা দে
শ্রী প্রকাশ ভবন
এ৬৫ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা ১২

প্রচ্ছদশিল্পী
চারু খান

মুদ্রাকর :
দুলাল ভূঁঞা
শ্রীময়ী প্রিণ্টার্স
২৪ তারক প্রামাণিক রোড
কলকাতা ৬

শোনো শোনো বুলবুল, টুলটুল, বাপ্পা,
চলবে না তোমাদের সাথে কোনো খাপ্পা !
জানিনে তো ভূত আর ডাকাতের গল্প
বাঘ আর কুমিরেরা হয়ে গেছে অল্প,
রাক্ষস-খোক্কস, রাজা-রাজপুত্তুর,
পার হয়ে চলে গেছে সাতটা সমুদ্দুর,
কী দিয়ে যে খুশি করি ভেবে নাহি পাই যে—
মাথা জোড়া টাক শেষে পড়ে গেল তাই যে !

এক মুঠো হাসি এনে দিই তবে সাজিয়ে
খাঁটি মেকি যা রয়েছে নিয়ো সব বাজিয়ে।

১৫.১.১৩৭১ পিসেমশাই

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

ছোটদের

ভালো ভালো গল্প

॥ সূচী ॥

মালটিপারপাস

বাবা বলেছিলেন, ভজার নাম এবার স্কুল-ফাইনালের লিস্টিতে সাদা কালিতে ছাপা হবে। কারণ ক্রিকেট, হকি আর বিশ্বকর্মা পুজোয় তার যে রকম মনোযোগ দেখা যাচ্ছে, তাতে পরীক্ষার দিকটা তার বিশেষ সুবিধে হবে না। কিন্তু এসব ভবিষ্যদ্বাণীকে সম্পূর্ণ মিথ্যে প্রমাণ করলো। সে ধাঁ করে ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করে বসলো।

বাবা চা খাচ্ছিলেন, শুনেই বিষম খেলেন। মা স্টোভে লুচি ভাজছিলেন, কড়াই উলটে গেল—একটুর জন্যে গরম ঘিয়ে (অথবা ঘি-মেশানো সেই তরল ব্যাপারটায়) তাঁর পা পুড়লো না। দাদা ফাউন্টেন পেন-এ কালি ভরছিলো, খানিকটা কালি তার ফিলসফির মোটা বইটার ওপর পড়ে গেল।

কী নিদারুণ দুর্ঘটনা !

বাবা বিষমটা সামলে নিয়ে বললেন, ট্রিকস-ফুকিস নি তো ?

ভজা গম্ভীর হয়ে বললো, ও-সব পাপ কাজের মধ্যে আমি নেই।

—ভজসত্য ভাদুড়ী নামে আর কোনো ছেলে আছে ক্লাসে ?

ভজা গম্ভীর হয়ে বললে, না—শুধু আমাদের ক্লাসে কেন, সারা বাংলা দেশেই অমন বিকট নামের ছেলে আর আছে কিনা সন্দেহ।

অন্য সময় হলে হয়তো ভজার এই পাকামোর জন্যে বাবা তার কান ধরে মুচড়ে দিতেন। কিন্তু আপাতত ভদ্রলোক এমনি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন যে, বার কয়েক ভীষণ বিব্রতভাবে নিজের টাকটা চুলকে নিয়ে, পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে দিয়ে ভজাকে বললেন, এইটে নিয়ে যা। ঘুড়ি, হকি-স্টিক আর ক্রিকেট-ব্যাট ছাড়া যা খুশি কিনতে পারিস !

হিংসেয় মুখ কালো করে দাদা কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু চকচকে নতুন নোটটা তাকে দেখিয়ে ভজা এক লাফে বাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। স্রেফ রকেটের মতো।

ভজসত্য ভাদুড়ী ওরফে ভজা—বাড়ি থেকে বেরিয়েই যাঁকে দেখতে পেলো, তিনি ঘোড়া-মামা। আসলে তিনি ঘোড়া নন—আদৌ কারো মামা কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাড়ার তিনি সার্বজনীন মামা—এবং মুখটা একটু বেশি লম্বা বলে ঘোড়া-মামা। সামনাসামনি অবিশ্যি ঘোড়াটা সবাই মনে মনে আউড়ে নেয় আর গলা ছেড়ে মামা বলে ডাকে।

ঘোড়া-মামা খুব সীরিয়াস ধরনের লোক। মানে, সব সময়ই তিনি দরকারী জিনিস নিয়ে চিন্তা করেন। যেমন, কলকাতার সেলুনে রোজ এত যে চুল-ছাঁটাই হয়—হয়তো বা মণ কয়েক চুলই কাটা হয় রোজ—এগুলো নষ্ট করে লাভ কী? এদের এক সঙ্গে জড়ো করলে নরম গদি হতে পারে, টেকো মানুষদের জন্যে পরচুলাও তো তৈরী করা যায়। কিংবা আকাশে এত যে মেঘ রয়েছে, প্লেনে করে তাদের মধ্যে যদি মাছের ডিম ছড়িয়ে দেওয়া যায় তা হলে আকাশেও বেশ মাছের চাষ হতে পারে। তাতে আরো সুবিধে এই যে, বর্ষা-বাদলের দিনে লোককে আর কষ্ট করে বাজারে যেতে হয় না—ঘরে বসেই এনতার মাছ পাওয়া যেতে পারে। কিংবা—

আর 'কিংবা'য় দরকার নেই, এ থেকেই ঘোড়া-মামার ব্যাপারটা বুঝতে পারা যাবে। নিতান্তই ম্যাট্রিকটা পাস করতে পারলেন না, নইলে আজ তিনি আইনস্টাইন কিংবা জগদীশ বোস গোছের কিছু একটা হয়ে যেতেন। আপাতত কিছুই করেন না—খান চারেক পৈতৃক ভাড়াটে বাড়ি আছে, তা থেকেই সংসার চলে যায়। এখন শুধুই ভাবেন—শাঁসালো শাঁসালো দরকারী জিনিস নিয়েই তাঁর ভাবনা।

রাস্তায় যেতে যেতে যা পান কুড়িয়ে নেন। জুতোর ছেঁড়া ফিতে, ঘোড়ার পায়ের নাল—তাই সই। ভাঙা মার্বেল—বলা যায় না, কাজে লেগে যেতে পারে। ঘোড়া-মামার বাড়ির একটা ঘরে এসব জিনিসের প্রায় একটা মিউজিয়ম তৈরী হয়ে রয়েছে; আর বললে বিশ্বাস করবে না—সেখানে একটা ছোট ভাঙা টিনের সাইনবোর্ড পর্যন্ত রয়েছে—যাতে লেখা: 'এইখানে উৎকৃষ্ট চিটাগুড় বিক্রয় হয়'।

যাই হোক, ঘোড়া-মামার ইতিহাস থাক। মানে, ভজার সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হলো, তখন তিনি একমনে একটা গুবরে পোকা কুড়োবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু পোকাটা সুড়ুৎ করে ডাস্টবিনের তলায় ঢুকে যাওয়াতে মন খুব খারাপ করে ঘোড়া-মামা উঠে দাঁড়ালেন, আর ভজাকে দেখতে পেলেন।

—এই যে ভজসত্য, কী বেপার? (ঘোড়া-মামার জিভে একটু দোষ আছে—উনি 'ব্যাপার'কে বলেন 'বেপার', চেঁচানোকে 'চিচাঁনো', পালিশকে বলেন 'পেলিশ')।

মনের খুশিতে 'ঘো' পর্যন্ত বলেই ভজা সেটাকে ঘোঁৎ করে গিলে ফেললে। বললো, মামা, আজ আমার বড়ো সুখের দিন। বাবা আমায় দশটা টাকা দিয়েছেন।

—অ, সেইজন্যেই এত চিচাঁচ্ছ? তা খামোকা তোমাকে দশ টাকা দিলেন কেনে?

—মানে—আনন্দে প্রায় নাচতে নাচতে ভজা বললে, আমি ফার্স্ট ডিভিসনে স্কুল ফাইনাল পাস করেছি কিনা—তাই।

অ, সি তো খুব সুখোবর (সুখবর)। সেইজন্যেই বুঝি পুরিস্কার দিয়েছেন তোমাকে?

—হ্যাঁ। আর বলেছেন, হকি-স্টিক, ক্রিকেট-ব্যাট আর ঘুড়ি ছাড়া আমি এ দিয়ে যা খুশি কিনতে পারি!

এইবার ঘোড়া-মামার বেশ উৎসাহ দেখা গেল। খোঁচা-খোঁচা দাড়ির ফাঁকে মনোহর হাসি ফুটলো একটু। —তা, কী কিনতে চাও?

ভজা বললে, এখনো ভেবে দেখি নি। মানে যা মনে ধরবে—

ঘোড়া-মামা বললেন, যা মনে ধরবে তাই কিনলেই তো চলবে না। বুঝে-সুঝে এমন জিনিস কিনতে হবে—যা দিয়ে অনেক কাজ হয়। যাকে বলে মেলটিপারপাস।

—মালটিপারপাস?

—হেঁ, মেলটিপারপাস। মানে—দশ রোকম কাজ হতে পারে। আচ্ছা, চলো, আমিই তোমার সঙ্গে যাই। বেছে বেছে এমন দরকারী জিনিস কিনে দিবো যে, সবাই বলবে—হেঁ, শাবাশ!

ঘোড়া-মামাকে সঙ্গে নিতে ভজার যে খুব উৎসাহ ছিলো তা নয়, কিন্তু এসব সীরিয়াস লোককে ঠেকানো খুব শক্ত, কখনোই তাদের দমানো যায় না। অগত্যা ঘোড়া-মামা ভজার সঙ্গ নিলেন আর যেতে যেতে কখনো দেশলাইয়ের খাপ, কখনো রাংতার টুকরো, কখনো জুতোর সুকতলা—এই সব কুড়িয়ে নিতে লাগলেন পথ থেকে।

ভজা তখন 'দি গ্রেট আবার খাবো রেস্তোরাঁ'র সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সেখান থেকে প্রাণ-কাড়া চপ ভাজার গন্ধ আসছিলো। বললে, ঘোড়া-মামা, আপনি যান, আমার একটু কাজ আছে।

কিন্তু ঘোড়া-মামাকে ফাঁকি দেওয়া গেল না। জ্বলন্ত চোখে ভজার দিকে তাকালেন তিনি।

—হুঁ-হুঁ—বুঝতে পেরেছি। ওই রিস্তঁরায় গিয়ে যা-তা খেয়ে টাকাগুলো সব উড়িয়ে দিবে? সিটি হচ্ছে না। কতকগুলো পচা মাংস খেয়ে শেষে অসুখে পড়ে যাবে। ছিঃ ভজা, এসব লোভ খুব খারাপ। না-না, ও চলবে নি। আমার সঙ্গে এসো—আমি খুব দরকারী জিনিস কিনে দিবো।

ভজা বুঝল, শক্ত পাল্লায় পড়েছে। ব্যাজার হয়ে সে ঘোড়া-মামার সঙ্গে চলতে লাগলো।

শ্যামবাজারের পাঁচমাথায় পৌঁছুতেই ভজার মন আকুল হয়ে উঠলো। সারি সারি দোকান ঝকমক করছে। সামনে পূজোর বাজার —জোর কেনাকাটা চলছে চারদিকে। ভজার মনে পড়লো, তার বন্ধু পটলডাঙার হাবুল সেন একটা মাউথ-অরগ্যান কিনেছে—যখন-তখন সেটা প্যাঁ-প্যাঁ করে বাজায়।

—আচ্ছা ঘো—মানে মামা!

ঘোড়া-মামা ফুটপাথে কী একটা কুড়োতে গিয়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

—হেঁ, কী বলছো?

—একটা মাউথ-অরগ্যান কিনলে কেমন হয়! অনেক দিনের শখ আমার।

শুনে ঘোড়া-মামা এত অবাক হলেন যে তাঁর মুখখানা প্রায় জেব্রার মতো দেখাতে লাগলো।

—মাউথ-ওরগ্যান? ওহো—সেই বিলিতী বাজনা? ও তো ছিলেপিলের ঝুমঝুমির মতো।—ঘোড়া-মামা নাক কোঁচকালেন : উসব দিয়ে কী হবে?

—না মামা, ও ছেলেপুলের নয়। রীতিমতো আর্টিষ্টিক জিনিস।

—এরটিসটিক? হেঁঃ! পেগোল (পাগল) হয়েছো নাকি? না-না! আমি যখন সঙ্গে আছি, তখন ওভাবে তোমার পয়সা নষ্ট করতে দিবো না। কত হাত মাটি কোপালে তবে একটা পয়সা বেরোয়—তা জানো?

ভজা জানে না। শুনেছে, তার বাবা নাকি অনেক টাকা মাইনে পান, কিন্তু তাঁকে কখনো সে এক হাতও মাটি কোপাতে দেখে নি। ভজা দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়ে মাথা চুলকোতে লাগলো।

ঘোড়া-মামা আবার জিগ্যেস করলেন, জানো ?

—আজ্ঞে, না।

—তা হলে গোলমাল কোরো না, এসো আমার সঙ্গে।

একটু এগিয়েই উত্তরা সিনেমা। টার্জানের একটা বই দেখানো হচ্ছে সেখানে। আর তার নিদারুণ পোস্টার দেখেই ভজার শিহরণ জাগলো।

—মামা ?

—হুঁ।

—একটা কাজ করলে কেমন হয় ! তুমি তো ব্যস্ত আছ, আমি বরং ডাফ স্কুল স্ট্রীটে একবার মাসিমার বাড়ি হয়ে—

কিন্তু ঘোড়া-মামাকে যতটা আপনভোলা মনে হয় তা আদৌ নন। রাস্তা থেকে এটা-ওটা কুড়িয়ে তাঁর নজর শেয়ালের চাইতেও ধারালো হয়ে গেছে। দাঁত ক'টা সব বের করে হাসলেন তিনি।

—চালাকি পেয়েছো ? ভাবছো বেপার আমি বুঝতে পারি না ? ঝাঁ করে বায়স্কোপ হলে ঢুকে পড়বে ? সিটি হচ্ছে না। পয়সা খোলামকুচি—না ? চলে এসো বলছি—

এবার ভজার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। বুঝলে, ঘোড়া-মামার দরকারী জিনিসের পাল্লায় পড়ে তার জীবনের কোনো সাধ মেটবার নয়। কেটে পড়তে না পারলে তার আর কোনোমতে নিস্তার নেই ! এ কী ল্যাঠায় পড়া গেল, বাস্তবিক ! সুযোগ পাওয়া গেল দু মিনিটের মধ্যেই।

রাস্তার ওপারে একটা লাল রিবনের টুকরো হাওয়ায় উড়ছিলো। 'আরে আরে' বলতে বলতে কোনোমতে একটা চলন্ত ট্রামের ধাক্কা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে ঘোড়া-মামা তীরবেগে ছুটলেন সেদিকে। আর সেই মুহূর্তেই পাশের একটা গলি দিয়ে হাওয়া হলো ভজা।

শ্যামপুকুর থানার পাশ দিয়ে, ভূপেন বোস অ্যাভিনিউ হয়ে ভজা আবার এসে দাঁড়ালো শ্যামবাজারের পাঁচমাথায়। এতটা পথ দৌড়ে এসে বুকের মধ্যে তার প্রায় হাঁফ ধরে গিয়েছিলো। খানিকক্ষণ দম নিয়ে চারদিক তাকিয়ে দেখলো সে। না—ঘোড়া-মামা কোথাও নেই। রাস্তা থেকে কুড়োতে কুড়োতে তিনি বোধ হয় এতক্ষণে আজাদ হিন্দ বাগের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন।

কী কেনা যায়? কিছু চকোলেট, কিছু ডালমুট?

নিশ্চয় কেনা যায়। 'দি গ্রেট আবার খাবো রেস্তোরাঁতে'ও বুক ঠুকে খেয়ে আসা চলে! এখন আর কোথাও কোনো বাধাই নেই। এমনকি টার্জানের ছবিটা দেখবার মতোও যথেষ্ট সময় হাতে আছে তার।

ঘোড়া-মামা যখন নেই, তখন সব হতে পারে। ভজার জীবনের কোনো সাধই এখন আর বাকী থাকবে না। এখন সে দুর্বার, বেপরোয়া। কিন্তু তার আগে একটা মাউথ-অরগ্যান কেনা যেতে পারে। হাবুল সেন বলেছিলো, পাঁচ-ছ টাকার মধ্যেই পাওয়া যাবে একটা। তার পরেও অন্তত চার টাকা হাতে থাকে। দশ আনা সিনেমা, এক টাকা রেস্তোরাঁ, এক টাকার চকোলেট—ওঃ, তাতেও শেষ হয় না। আরো সাত দিন ডালমুট খাবার মতো সঞ্চয় থেকে যায়। দশ টাকা যে এত বেশি, এমন ভয়ানক বেশি—ভজা আগে তো ভাবতেও পারে নি। রঙীন স্বপ্নে ভজার মন আকুল হয়ে উঠলো। মাউথ-অরগ্যানের দোকানেই ঢুকে পড়লো প্রথমে।

—একটা মা—

ব্যস্—ওই পর্যন্তই? মাউথ-অরগ্যান আর কেনা হলো না, একটা মা থেকে আর-এক মা বেরিয়ে এলো। অর্থাৎ ঘপাং করে পেছন থেকে তার ঘাড়টি চেপে ধরেছেন মামা স্বয়ং।

খোঁচা-খোঁচা দাড়ির ভেতর থেকে ঘোড়া-মামা হাসলেন।

—বলি, আমার সঙ্গে চেলাকি? ভেবেছিলে, পালিয়ে যাবে? কিন্তু আমি তো জানি, তোমার মন এইখেনেই ছোঁক-ছোঁক করছে। ওৎ পেতে ছিলুম, এসেই ক্যাঁক করে ধরে ফেলেছি।

ভজা খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইলো। মেঝেয় বসে পড়তে পড়তে সামলে নিলে অনেক কষ্টে।

জ্বলন্ত চোখে ঘোড়া মামা বললেন, ও চলবে নি। দশ টাকার নোটটা আমায় দাও তো।

ফাঁসির আসামীর মতো ভজা নোটটা তাকে এগিয়ে দিলে। সে বুঝতে পেরেছে—যমদূতকে যদি বা ফাঁকি দেওয়া যায়, ঘোড়া-মামার হাত এড়ানো অসম্ভব। সে যদি পাতালে গিয়ে ঢোকে, তাহলে ঘোড়া-মামা সেখানেও সুলো ঢুকিয়ে তাকে টেনে বের করবেন। ওফ্!

নোটটা হস্তগত করে মামা হাসলেন।

—খুব মন খারাপ হয়েছে, না রে? ভাবছিস, আমি তোর সব সাধে বাগড়া দিচ্ছি? আরে না—না! তোর জন্যে দরকারী জিনিস পছন্দ করেই রেখেছি আমি। দেখলে ফূর্তিতে নাচতে থাকবি। আয়—আয়—

—কী জিনিস মামা?—নিদারুণ অন্ধকারে ডুবতে ডুবতেও ভজার প্রাণে একবার দোলা লাগলো: কী কিনতে চাও, আমার জন্যে?

—দর করে রেখেছি। চারটে। বারো টাকা চেয়েছিলো, ন টাকায় রফা করেছি। পাহাড়ের মতো বড়ো বড়ো এক-একটা। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

—কিসে চোখ জুড়োয় মামা? কী চারটে? কী পাহাড়ের মতো বড়ো বড়ো?···আকুল স্বরে জানতে চাইলো ভজা, সবটাই যেন রহস্যের খাসমহল বলে মনে হলো তার কাছে।

—আয় দেখবি। স্বচক্ষেই দেখতে পাবি।

দেখা গেল—অদূরেই।

মস্ত গোঁফওলা একটা লোক। ফুটপাথে পেল্লায় ঝুড়ি নামিয়ে রেখেছে একটা। তাতে হাতির বাচ্চার মতো চারটে চালকুমড়ো।

—মামা, এ যে চালকুমড়ো!—গলা চিরে একটা আর্তনাদ বেরুলো ভজার।

ঘোড়া-মামার হাসি দুদিকে ছড়াতে ছড়াতে প্রায় কান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুলো। কুমড়োওলাকে নোটটা দিয়ে বললেন, হেঁ—চালকুমড়ো। মেলটিপারপাস। ঘন্টা হয়, ডালে দেওয়া যায়, বড়ি হয়। পশ্চিমে চিনিতে জ্বাল দিয়ে 'পেঠা' তৈরী করে। মোরব্বা হয়। মাথায় দিয়ে শোয়া চলে, শিকেয় ঝুলিয়ে রাখলে ঘরের বেউটি (বিউটি) হয়, অনেকদিন থাকে। খাসা জিনিস! যে দেখবে, সে বলবে—হেঁ, কিনে দিয়েছে বটে একখানা। নাও, এখন এগুলোকে রিকশায় তুলে বাড়ি চলে যাও।

বলেই, গুঁফো লোকটার কাছ থেকে এক টাকার ফেরত নোটটা নিয়ে বজ্রাহত ভজার হাতে গুঁজে দিলেন ঘোড়া-মামা। তার পরেই, রাস্তার ঝাঁজির ধারে একটা নেংটি-ইঁদুর দেখে—সেইটেকে কুড়োবার জন্যেই বোধ হয়—সোজা পাঁই-পাঁই করে ছুটে গেলেন সেদিকে।

বেয়ারিং ছাঁট

পটলডাঙার টেনিদা, আমি আর হাবলু সেন চাটুজ্জেদের রকে বসে মন দিয়ে পেয়ারা খাচ্ছি। হঠাৎ দেখি, ক্যাবলা বেশ কায়দা করে—নাকটাকে উচ্চিংড়ের মতো আকাশে তুলে সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। কেমন একটা আলেকজাণ্ডারের মতো ভঙ্গি—যেন দিগ্বিজয় করতে বেরিয়েছে।

টেনিদা খপ্ করে একটা লম্বা হাত বাড়িয়ে ক্যাবলাকে ধরে ফেললো।

—বলি, অমন তালেবরের মতো যাওয়া হচ্ছে কোথায়? নাকের ডগায় একটা চশমা চড়িয়েছিস বলে বুঝি আমাদের দেখতেই পাসনি!

ক্যাবলা বললে, দেখতে পাবো না কেন? একটু কাজে যাচ্ছি—

—এই রোববার সকালে কী এমন রাজকার্যে যাচ্ছিস র‍্যা? নেমন্তন্ন খেতে নাকি? তাহলে আমরাও সঙ্গে যাই।

ক্যাবলা গম্ভীর হয়ে বললে, না—নেমন্তন্ন না। আমি চুল ছাঁটতে যাচ্ছি।

—চুল ছাঁটতে?—টেনিদা শুনে দারুণ খুশি হলো: ডি-লা গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস্! চল—আমিও যাচ্ছি।

এইবার আমার পালা। আমি চেঁচিয়ে বললুম, খবরদার ক্যাবলা, টেনিদাকে সঙ্গে নিয়েছিস কি মরেছিস! গত বছর টেনিদা আমাকে এমন একখানা 'গ্রেট-ছাঁটাই' লাগিয়েছিলো যে, আমার বৌভাতের নেমন্তন্ন খাওয়া একদম বরবাদ।

টেনিদা চটে বললে, তুই একটা পয়লা নম্বরের পেঁয়াজ-চচ্চড়ি। বেশ ডিরেকসন দিয়ে দিয়ে চুল ছাঁটাচ্ছিলুম—চেঁচিয়ে-মেচিয়ে ভণ্ডুল

করে দিলি। না রে ক্যাবলা, তোর কোনো ভয় নেই। আমি অ্যায়সা কায়দা করে তোর চুল ছাঁটিয়ে আনবো যে, কী বলে—তোর মাথা দিয়ে কী বলে—একেবারে শিখা বেরুতে থাকবে।

হাবুল বললে, হ, শিখাই বাইর হইবো। শিখার মানে হইলো গিয়া টিকি।

আমি বললুম, তা বেশ তো—তুই টিকিই রাখ ক্যাবলা। আমরা সবাই বেশ করে টানতে পারবো।

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, টেক কেয়ার! টিকি নিয়ে টিক-টিকির মতো টিক্ টিক্ করবিনে—বলে দিচ্ছি! শিখা মানে বুঝি আর কিছু হয় না? তা হলে আলোর শিখা মানে কী? আলোর টিকি? আলোর কখনো টিকি হয়? কোন্ দিন বলবি, অন্ধকারের টিকি—চাঁদের টিকি—

হাবুল খুব জ্ঞানীর মতো বললে, চাঁদের টিকি ধইর্যা রাশিয়ানরা তো টান মারছে!

আমি বাধা দিয়ে বললুম, কক্ষণো না। চাঁদের মাথা ন্যাড়া—আমাদের পাড়ার নকুলবাবুর মতো। চাঁদের টিকি নেই।

ক্যাবলা বললে, উঃ—এরা তো মাথা ধরিয়ে দিলে দেখছি। ঘাট হয়েছে, আমি আর চুল ছাঁটতে চাই না। এই বসছি।

টেনিদা হতাশ হয়ে বললো, বসলি?

—হ্যাঁ, বসলুম।

—আমাকে নিয়ে চুল ছাঁটতে যাবিনে?

—না।—ক্যাবলার মুখে একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা দেখা দিলে: তোমাকে নিয়ে তো নয়ই। প্যালার সেই গ্রেট ছাঁটাই আমি দেখেছি, ও যে গল্পটা লিখেছিলো মনের দুঃখে, সেটাও পড়েছি।

টেনিদা মন খারাপ করে বললে, তোর ভালোর জন্যেই বলেছিলুম।

মানে আমার ভুলোদার মতো সস্তায় কিস্তিমাৎ করতে গিয়ে না পস্তাস, সেইজন্যেই বলছিলুম।

আমি বললুম, ব্যাপারটা খুলে বলো তা হলে। কী হয়েছিলো তোমার ভুলোদার ?

—কী হয়েছিলো ভুলোদার ? টেনিদা টকাং করে আমার চাঁদিতে ছোট্ট একটা গাঁট্টা মারলে : ফাঁকি দিয়ে গপ্পোটা বাগাবার চেষ্টা আর সেইটে পত্রিকায় লিখে দেবার মতলব ? ও-সব চালাকি চলবে না। ভুলোদার সেই প্যাথেটিক কাহিনী শুনতে হলে চার আনার তেলেভাজা আগে আনো—কুইক !

আমার পকেটে দু'আনা ছিলো, আরও দু'আনা হাবুলের কাছ থেকে আমায় ধার করতে হলো।

দু'খানা বেগুনী একসঙ্গে মুখে পুরে দিয়ে টেনিদা বললে, আমার ভুলোদা—মানে আমাদের দূর-সম্পর্কের জ্যাঠামশাইয়ের এক ছেলে—পয়সা-কড়ির ব্যাপারে ছিলো বেজায় টাইট। জ্যাঠামশাইয়ের টাকার অভাব ছিলো না, ভুলোদাও কী সব ধান-পাটের ব্যবসা করত—কিন্তু একটা পয়সা খরচ করতে হলে ভুলোদার চোখ কপালে উঠে যেত।

বললে বিশ্বাস করবিনে, একদিন বাজারে গিয়ে টুক করে একটা নয়া পয়সা পড়ে গেল নালার ভেতরে। বাজারের নালা—বুঝতেই পারছিস ! যেমন নোংরা—তেমনি বদ্‌খৎ গন্ধ—তার ওপরে এক হাত পাঁক। দেখলেই নাড়ী উলটে আসে। কিন্তু ভুলোদা ছাড়বার পাত্তর নয়। এক ঘন্টা ধরে দু'হাতে সেই নালা ঘাঁটলে। আর একটার বদলে চার-চারটে নয়া পয়সা মিললো তার ভেতর থেকে, একটা অচল সিকি পেলে, দুটো মরা সিঙ্গি মাছ আর জ্যান্ত একটা

খল্‌সে মাছও পেয়ে গেল ! তিনটে নয়া পয়সা নগদ লাভ হলো, সেদিন আর মাছও কিনতে হলো না।

হাবুল বললে, এ রাম !—থু—থু—

টেনিদা বললে, থু-থু ? জানিস, ভুলোদা এখন কত বড়োলোক ? বাড়িতে গামছা পরে বসে থাকে, কিন্তু ব্যাঙ্কে তার কত টাকা !

ক্যাবলা বললে, আমাদের বড়োলোক হয়ে কাজ নেই, বেশ আছি। পচা ড্রেন থেকে মরা সিঙ্গি মাছ খেতে পারবো না—গামছা পরেও বসে থাকতে পারবো না।

টেনিদা বললে, না পারবি তো যা—কচুপোড়া খেগে।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, আঃ—ঝগড়া করছো কেন ? গল্পটা বলতে দাও না।

টেনিদা গজ-গজ করতে লাগলো : ইঃ—বড়োলোক হবেন না ! না হলি তো না হলি—অত তড়পানি কিসের জন্যে র‍্যা ? মরা সিঙ্গি মাছ খেতে না চাস, জ্যান্ত তিনি মাছ খা—গামছা পরতে না চাস আলোয়ান পরে বসে থাক। ওসব ধ্যাষ্টামো আমার ভালো লাগে না—হুঁঃ !

আমি বললুম, গপ্পোটা—

—গপ্পোটা !—টেনিদা মুখটাকে ডিম-ভাজার মতো করে বললে, ধ্যাৎ ! খালি কুরুবকের মতো বকবক করলে গপ্পো হয় ?

ক্যাবলা বললে, কুরুবক এক রকমের ফুল। ফুল কখনো বকবক করে না।

টেনিদা চেঁচিয়ে বললে, শাট্ আপ ! আমি বলছি কুরুবক এক রকমের বক—খুব বিচ্ছিরি বক। ফের যদি আমার সঙ্গে তক্কো করবি, তা হলে আমি এক্ষুণি কাঁচি এনে তোকে একটা গ্রেট্ ছাঁটাই লাগিয়ে দেবো।

শুনে ক্যাবলার মুখ-টুখ একবারে শুঁটকি মাছের মতো হয়ে গেল। বললে, না-না, তুমি বলে যাও। আমি আর তক্কো করবো না।

—করিসনি। বেঘোরে মারা যাবি তা হলে। বলে—কুরুবক একরকমের ফুল। তা হলে গরুও এক রকমের ফল, রসগোল্লা এক রকমের পাখি, বানরগুলোও এক রকমের পাকা তাল! যা—যা—চালাকি করিসনি।

আমি বললুম, কিন্তু ভুলোদা—

—আরে গেল যা! এটা যে ভুলোদা ভুলোদা করে ক্ষেপে যাবে দেখছি!—টেনিদা আমার চাঁদিতে আর একটা গাঁট্টা মারলে: সিঙ্গি মাছ দিয়ে নিজেও পটলের ঝোল খায় কিনা—তাই এত ফুরতি হয়েছে।—বলে তেলেভাজার ঠোঙা থেকে শেষ আলুর-চপটা মুখে পুরে দিয়ে বললে, একদম সাইলেন্স! নইলে গল্প আমি আর বলবো না!

আমরা বললুম, আচ্ছা—আচ্ছা!

টেনিদা শুরু করলো:

ভুলোদা পশ্চিমে কোথায় ব্যবসা করতো। ওদেশে থাকবার জন্যে—আর পয়সা বাঁচাবার জন্যে তো বটেই, একেবারে পুরোপুরি দেশোয়ালী বনে গিয়েছিলো। মোটা কুর্তা পরতো, পায়ে দিতো কাঁচা চামড়ার নাগরা—গড়গড়িয়ে দেহাতী তালুতে সব সময় খৈনি ডলতো। পানকে বলতো 'পানোয়া'—সাপকে বলতো 'সাঁপোয়া'। আমরা কিছু জিগেস করলে অন্যমনস্কভাবে জবাব দিতো 'কুছ, কহলি হো?'

কামাতে খরচ হবে বলে দাড়ি রেখেছিলো। তাতে বেশ সাধু-সাধু দেখাত আর গাঁয়ের সাদাসিধে মানুষ কিছু ভক্তি-ছেদ্দাও করত। কিন্তু চুলটা মাঝে মাঝে না কাটলে মাথা কুট-কুট করে। তা ছাড়া

কী বলে—রাত-দিন টাকার ধান্দায় ঘুরে ভুলোদা খুব সাফসুফ থাকতেও পারে না। জামা কাচে মাসে একবার, চান করে বছরে চারবার। তাই চুল একটু বেশি বড়ো হলেই উকুন এসে বাসা বাঁধে। কিন্তু চুল ছাঁটাইয়েও ভুলোদার খরচা ছিল না। বেশ একটা কায়দা করে নিয়েছিলো। কী কায়দা বল্ দিকি ?

আমি বললুম, বোধ হয় নিজেই কাঁচি দিয়ে ছাঁটাই করত।

টেনিদা সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল'র কাকটার মতো দুলে দুলে বললে, হয় নি—হয় নি—ফেল !

হাবুল বললে, হ, বুঝছি। নিজের মাথার চুল খামচা খামচা কইরা টাইনা তুলতো !

—ইঃ—কী বুদ্ধি ! মগজ তো নয়—যেন নিরেট একটি খাজা কাঁঠাল বসে আছে ! আয় ইদিকে—খিমচে খিমচে তোর খানিক চুল তুলে দি। কেমন লাগে, টের পাবি।

টেনিদা হাত বাড়াতেই হাবুল সড়াৎ করে এক লাফে রক থেকে নেমে পড়লো।

ক্যাবলা বললে, আমরা ও-সব কায়দা-ফায়দার খবর জানবো কোত্থেকে ! তুমিই বলো।

টেনিদা তেলেভাজার ফাঁকা ঠোঙাটা খুঁজে একটা কিসের ভাঙা টুকরো পেলে। অগত্যা সেইটেই মুখে পুরে দিয়ে বললে, কায়দাটা বেশ মজার। ভুলোদা নজর করে দেখেছিলো, দেহাতী নাপিতদের মধ্যে বেশ সুন্দর একটা নিয়ম আছে। চুল-দাড়ি ছাঁটাতে স্বজাতির কাছ থেকে ওরা কখনো পয়সা নেয় না। গিয়ে নমস্কার করে সামনে বসলেই বুঝে নেবে—এ আমার সমাজের লোক। তখন দিব্যি একখানা ফ্রী হেয়ার কাট্ ! আসবার সময় আর একটা নমস্কার করে উঠে এলেই হলো—একটা পয়সা খরচ নেই !

ভুলোদাও শিখে গিয়েছিলো। ব্যবসার কাজে এ গাঁয়ে ঘুরে বেড়াতো—আসতে যেতে ছুটি নমস্কার ঠুকলেই—ব্যস, কাজ হাসিল।

সেদিনও তাই করেছে। 'রাম রাম ভেইয়া' বলে তো বসে পড়েছে এক নাপিতের সামনে, চুল ছাঁটাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেহাতী ভাষায় নানান গপ্পো চলছে। চাষের অবস্থা কেমন, কোথায় 'ভাণ্ডা কে ভর্তা' মানে বেগুনের ঘণ্ট—দিয়ে আচ্ছা পুরী খাওয়া যায়, কোন্ গাছে 'তিনোয়া চূড়েল'—মানে তিনটে পেত্নী 'রহতী বা'। এই সব সদালাপের ভেতর দিয়ে ভুলোদার চুল কাটা তো শেষ হলো।

'চলে ভেইয়া—রাম রাম—' বলে ভুলোদা পা বাড়াতে যাবে, তক্ষুণি একটা কাণ্ড হলো।

সামনেই গঙ্গা। একটা খেয়া নৌকো ওপার থেকে এপারে লাগলো। আর দেখা গেল সেই নৌকো থেকে নেমে জনা পনেরো লোক এদিক পানেই আসছে। বুড়ো থেকে ছোকরা পর্যন্ত সব বয়সের লোক আছে তাদের ভেতর।

দেখেই নাপিতের চোখ কপালে উঠলো। 'হায় রাম' বলে খাবি খেলো একটা। ভুলোদা গুটি গুটি চলে যাচ্ছিলো, হঠাৎ নাপিত খপ্ করে হাত চেপে ধরলে তার।

—এই, ভাগতা কেঁও? বৈঠো!

ভুলোদা অবাক! পয়সা চায় নাকি? দেহাতী ভাষায় বললে, আমি পয়সা দেবো কেন? আমি তো তোমার স্বজাত!

নাপিত বললে, সে বলতে হবে না—আমি জানি। ওই যে পনেরোজন লোক আসছে, দেখছো না? ওদের কামাতে হবে এখন। আমি একা পারবো কেন? তুমিও আমাদের স্বজাত—হাত লাগাও।

—অঁ্যা!

নাপিত টেনে ভুলোদাকে পাশে বসিয়ে দিলে। বললে, কী

করবে ভেইয়া—দেশ গাঁয়ের নিয়ম তো মানতে হয়। ওরাও আমাদের জাত-কুটুম। গাঁয়ে লোক মরেছে—তাই সবাই কামাতে আসছে এপারে।

নাপিত একটা খাবি খেয়েছিলো, ভুলোদা চারটে বিষম খেলো।

তা-তা—ওরা এপারে কেন? ওপারে কামালেই তো পারতো।

নাপিত রেগে বললে, বুদ্ধু! স্বজাত হয়েও যেন কিছু জানো না! কামাবে কে—সবারই তো অশৌচ।

ভুলোদা ততক্ষণে হাঁ করে বসে পড়েছে। মুখের ভেতর টপাৎ করে একটা পাকা বটের ফল পড়লো, টেরও পেলে না। ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে। আর বুঝেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তার।

বুঝলি! আরো সব মজার নিয়ম রয়েছে ওদের দেশে। গাঁয়ে কেউ মরলেই সমস্ত পুরুষ মানুষকে মাথা কামাতে হবে—দাড়ি চাঁছতে হবে। তাই সব সুদ্ধু এপারে এসে পৌঁছে গেছে।

ভুলোদা তবু একবার শেষ চেষ্টা করলে। আমার বহুৎ কাজ আছে—পেটমে দরদ হচ্ছে—

এর মধ্যে পনেরোজন লোক এসে পড়েছে। নাপিত ধমক দিয়ে বললে, আভি চুপ করো—ক্ষুর লে লেও।—বলেই ভুলোদার হাতে ক্ষুর ধরিয়ে দিলে একখানা।

পনেরোজন এসে তো 'রাম রাম' বলে নমস্কার করে গোল হয়ে বসে পড়লো। ভুলোদার তখন মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে—হাত-পা একেবারে হিম। ম্যালেরিয়ায় ভোগা রোগা পটকা লোক তো নয়—ইয়া ইয়া সব জোয়ান। সঙ্গে পাকা পাকা বাঁশের লাঠি। এমন করে ঘিরে বসেছে যে, পালানোর রাস্তাঘাট সব বন্ধ।

পয়সা দিয়ে দাড়ি কামাবার ভয়ে কোনো দিন ক্ষুর ধরেনি—চুল-

ছাটা তো বেয়ারিং পোস্টেই চালিয়েছে এতকাল। মাথা-মুখ কামাবে কি—কিছুই জানে না। কিন্তু সে কথা বলবারও জো নেই। এক্ষুণি দিব্যি বিনি-পয়সায় চুল কেটে নিয়েছে। যদি বলতে যায়, আমি তোমাদের সমাজের লোক নই—তা হলে কেবল নাপিতই নয়, সবসুদ্ধ ষোলজন লোক তাকে অ্যায়সা ঠ্যাঙানি দেবে যে, ভুলোদা কেবল তক্তা নয়—একেবারে তক্তাপোশ হয়ে যাবে। চেয়ার টেবিল হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

নাপিত ততক্ষণে একজনের মাথা জলে ভিজিয়েছে একটুখানি, তারপর ঘচাঘচ ক্ষুর চালাতে শুরু করেছে। আর একজন দিব্যি উবু হয়ে ভুলোদার দিকে মাথা বাড়িয়ে দিয়ে ঘুঘুর মতো বসে আছে।

ওদিকে ভুলোদা চোখ বুজে বলছে: হে মা-কালী, এ যাত্রা আমায় বাঁচাও। তোমায় আমি সোয়া পাঁচ আনার—না—না—বড্ড বেশি হয়ে গেল—সোয়া পাঁচ পয়সার পূজো দেবো!

হাবুল চুক চুক করে বললে, ইস্—ইস্! আইচ্ছা ফ্যাচাঙে তো পইড়্যা গেছে তোমার ভুলোদা!

আমি বললুম, কিন্তু কী কিপ্‌টে দেখেছিস! তখনো পয়সার দিকে নজরটা ঠিক আছে।

টেনিদা বললে, তা আছে! ওই জন্যেই তো মা-কালী ওকে দয়া করলেন না। সাদাসিধে মানুষগুলোর হকের পয়সা এইভাবে ঠকানো! এখন বোঝো মজাটা।

ভুলোদা তো সমানে জপ করছে: মা—মা—সোয়া পাঁচ আনা—না—না—সোয়া পাঁচ পয়সার পূজো দেবো—আর এদিকে যে লোকটা মাথা পেতে ঠায় বসেই ছিলো, তার ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেছে। সে রেগে ভুলোদার পেটে একটা খোঁচা দিয়ে বললে, আরে হাঁ করকে কাহে বৈঠা হায়? হাত লাগাও—

ভুলোদা দেখলে, আর উপায় নেই। তক্ষুণি লোকটার মাথায় ক্ষুর বসিয়ে দে এক টান!

জল-টল কিছু দেয়নি—চুল ভেজেনি—ওভাবে ক্ষুর লাগালে কী হয়, বুঝতেই পারিস!

'আরে হাঁ—হাঁ—ক্যা করতা—বলে লোকটা চেঁচিয়ে উঠলো, আর ভুলোদা—গিঁ—গিঁ—গিঁ—বলে আওয়াজ তুলেই ঠায় অজ্ঞান।

সত্যি সত্যিই অজ্ঞান? আরে, না—না! প্রাণটা তো বাঁচাতে হবে। তাই অজ্ঞান হওয়া ছাড়া ভুলোদা আর কোনো রাস্তা খুঁজে পেলে না।

তখন চারিদিকে ভারী গোলমাল শুরু হলো।

—আরে, ক্যা ভৈল? ক্যা ভৈল? মর গেইল কা?—ক্ষুরের ঘায়ে যে লোকটার চাঁদি ছুলে দিয়েছে—সে পর্যন্ত তার পেল্লায় চাঁটিটা সামলে নিলে।

—এ জী, তুমারা ক্যা ভৈল? মানে—ওহে, তোমার কী হলো?

ভুলোদা বলে চললো: গিঁ—গিঁ—গিঁ—

তখন একজন বললে, ভূত পাকড়লি, কা?—মানে ভূতে ধরলো!

সকলে একবাক্যে বললে, তাই হবে!

ব্যস—আর কথা নেই। ষোলোজন লোক তক্ষুণি ভুলোদাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চললো যেভাবে শূয়োর নিয়ে যায় আর কি! ভুলোদার হাত-পা যেন ছিঁড়ে যেতে লাগলো—একটুখানি নধর ভুঁড়ি হয়েছিলো, সেটা নাচতে লাগলো ফুটবলের মতো। কিন্তু ষোলোজনের কাছ থেকে বাঁচতে হলে চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় নেই। তখন গলা দিয়ে গিঁ গিঁ—নয়—সত্যিকারের গোঁ গোঁ বেরুচ্ছে!

নিয়ে ফেললে এক রোজার বাড়ীতে। সবাই মিলে চেঁচিয়ে বললে, ভূত পাকড়লি!

রোজা বললে, ঠিক হ্যায়—আচ্ছাসে পাকড়ো।

অমনি সবাই মিলে ভুলোদার হাত-পা ঠেসে ধরলে। ভুলোদা তেমনি গোঁ-গোঁ করতে লাগলো।

এদিকে রোজা কতকগুলো শুকনো লঙ্কার মতো কী পুড়িয়ে ভুলোদার নাকে ধোঁয়া দিতে শুরু করলে। ফ্যাঁচচো ফ্যাঁচচো করে হাঁচতে-হাঁচতে ভুলোদার তো নাড়ী ছিঁড়ে যাবার দাখিল।

তারপরেই রোজা করেছে কি—কোত্থেকে একটা খ্যাংরা ঝাঁটা এনে—কী সব বিড়-বিড় করে বকতে-বকতে ভুলোদাকে ঝপাং-ঝপাং করে পিটতে আরম্ভ করেছে।

ভুলোদার অবস্থা তখন বুঝতেই পারছিস! গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগলো : বাবা-রে—মা-রে—ঠন্‌ঠনের কালী-রে—আমার দফা সারলে রে—আমি গেলুম রে!

নাপিতরা চোখ বড়ো বড়ো করে বললে, বাংলা বোল্ রহা।

তখন সবাই বললে, আঁ—বঙালী ভূত পকড়লি! রাম—রাম—রাম—।

রোজা মাথা নাড়লে। বললে, বাঙালীর ভূত বহুৎ জব্বর ভূত। আরো জোর ঝাঁটা চালাতে হবে।

ঝপাং—ঝপাং—ঝপাং—! তার ওপরে নাকে সেই লঙ্কা-পোড়ার গন্ধ। ভুলোদা আর কিছু টের পেলে না।

উঠে বসলো তিনঘণ্টা পরে। একটু একটু করে ব্যাপারটা খেয়াল হচ্ছে তখন। দেখলে, দু'শো গাঁয়ের লোক তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। তার মাথা পরিষ্কার করে কামানো—একেবারে ন্যাড়া—মুখে একটি দাড়ির চিহ্ন নেই, এমন কি ভুরু পর্যন্ত নিটোলভাবে চাঁছা। চাঁদির ওপরে দুর্গন্ধ কী একটা প্রলেপ মাখানো—গা ভর্তি জল আর কাদা।

হেসে রোজা বললে, হাঁ, আব ঠিক হোই। ভূত ভাগ্ গইল বা।

হাঁ—সেই থেকে ভূত সত্যিই পালিয়েছে ভুলোদার। এখন আর সস্তায় কিস্তিমাৎ করতে চায় না। নিয়মিত সেলুনে গিয়ে—নগদ আটগণ্ডা পয়সা খরচ করে চুল ছেঁটে আসে।

তাই বলছিলুম, ওরে ক্যাবলা—

রেগে ক্যাবলা উঠে দাঁড়ালো : আমি তোমার ভুলোদার মতো বিনি পয়সায় চুল ছাঁটতে চাইছিলুম—একথা তোমায় কে বললে ?

তারপর তেমনি কায়দা করে—নাকের ওপর চশমাটাকে আরো উঁচুতে তুলে, আলেকজাণ্ডারের ভঙ্গিতে গটমটিয়ে চলে গেল।

বলটুদার উৎসাহলাভ

আমি বরাবর দেখেছি, আমাদের বলটুদার যখন তেজ এসে যায়, তখন তাকে ঠেকানো ভারী মুশকিল।

রবিবার সকালে দিব্যি চাটুজ্জ্যেদের রকে বসে আছি আর একটা কাকের পালক কুড়িয়ে নিয়ে আরামে কান চুলকোচ্ছি, হঠাৎ কোত্থেকে বলটুদা এসে হাজির। বললে, চল্ প্যালা—একটু বেরোনো যাক।

—কোথায় যেতে হবে ?

—মানে, বন্ধু-বান্ধবদের একটু উৎসাহ দেওয়া দরকার। দেখছিস নে—সব কেমন মিইয়ে যাচ্ছে ?

শুনে কানের ভেতর আচমকা একটা পালকের খোঁচা লেগে গেল !

—সে আবার কী ? কাকে তুমি উৎসাহ দেবে ?

—যাকে পাই। বুঝলি, চারিদিকে সবাই যেন কি রকম দমে যাচ্ছে। এই তো সেদিন তোর বন্ধু হাবুল সেনকে বললুম, চল্ হাব্‌লা, একটা অ্যাডভেঞ্চারের ফিলিম হচ্ছে—দু'জনে মিলে দেখে আসি। তোর পকেটে যদি পাঁচ সিকে পয়সা থাকে, তা হলেই হয়ে যাবে এখন। বললে বিশ্বেস করবি না প্যালা, হাবুল একেবারে খ্যাঁক-খ্যাঁক করে উঠলো। আমার নাকের সামনে হাত নেড়ে বললে, থাউক, অত আহ্লাদ করতে হইব না। যাইতে হইলে একাই যামু—তোমারে নিমু ক্যান্ ? শুনলি একবার কথাটা ? দেশের এ কী অবস্থা হলো বল্ দিকি ?

আমি বললুম, হুঁ—দেশের অবস্থা খুব খারাপ। কিন্তু তাই বলে যদি আমাকে উৎসাহ দিতে এসে থাকো, তবে সুবিধে হবে না, তা

বলে দিচ্ছি। আমার পকেটে ঠিক তিনটে নয়া পয়সা আছে। চাও তো তা থেকে একটা তোমায় দিতে পারি।

বলটুদা নাকটাক কুঁচকে, মুখটাকে মোগলাই পরোটার মতো করে বললে, থাক থাক, তোমায় আর দয়া করতে হবে না। তুই যে এক নম্বরের ট্যাঁকখালির জমিদার সে কি আর আমি জানিনে? চল্—আমাদের অভিলাষকে একটু উৎসাহ দিয়ে আসি।

অভিলাষের নাম শুনে আমার কান খাড়া হয়ে উঠলো।

—কোন্ অভিলাষ? ওই যে সিনেমার সামনে নতুন রেস্তোরাঁ খুলেছে?

বলটুদা বললে, আবার কে? উৎসাহ দিতে হলে ভালো ভালো লোককেই দেওয়া উচিত—আজে বাজে লোককে দেওয়া আমি পছন্দ করি না। নে—উঠে পড়—

তক্ষুণি উঠে পড়লুম।

—কী রকম উৎসাহ দেবে বলটুদা?

—চল্ না, দেখতেই পাবি।

পরমানন্দে উঠে পড়লুম। আমার আর ভাবনা কী। পকেটে তো মোট তিনটে নয়া পয়সা। তা ছাড়া বলটুদার মনে যখন একবার উৎসাহ দেবার তেজ এসে গেছে তখন আর ওকে ঠেকাবে কে?

—ডি লা গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস্—বলতে বলতে বলটুদার পেছু নিলুম।

অভিলাষ পাড়ার ছেলে। ওর বাবার মস্ত বড়ো পটোলের ব্যবসা। তাই অভিলাষকে বেশি লেখাপড়া না শিখিয়ে পটোলের ব্যবসায় লাগিয়ে দিয়েছিলেন। দু'বছর ধরে অভিলাষ এমন ব্যবসা করলে যে, পটোলের দোকান পটোল তোলে আর কি! তখন ওর বাবা রেগে মেগে ওকে কষে দুটো থাপ্পড় দিলেন। অভিলাষ তাই

শেষ পর্যন্ত এই রেস্তোরাঁ খুলেছে আর মনের দুঃখে পটোল ভাজা পর্যন্ত খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।

আমরা যখন গেলুম, তখন ওর দোকানে বিশেষ লোকজন নেই। একজন ঝাঁটা-গুঁফো ভদ্রলোক তারিয়ে তারিয়ে ডিমের পোচ খাচ্ছেন, আর এক বুড়ো নাকের ডগায় খবরের কাগজটা ধরে বসে আছেন।

আমাদের দেখেই অভিলাষের হাসি কান ছাপিয়ে, নাকের ডগা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়লো।

—এই যে, এসো বলটুদা—আয় প্যালা—

বলটুদা আর আমি ততক্ষণে ছুটো চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়েছি। বলটুদা বললে, আরে আসবো বই কি। তুইব ললে আসবো, না বললে আসবো, তাড়িয়ে দিলেও আসবো।

শুনে অভিলাষ হেঁ-হেঁ করলো।

—আরে তাড়াবো কেন? তোমরা হলে খদ্দের—দোকানের লক্ষ্মী। কী খাবে বলো।

বলটুদা বললে, কী খাবো না, তাই বল্। তোকে উৎসাহ দেবার জন্যেই তো প্যালাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলুম। তোর কেক খাবো, বিস্কুট খাবো, টোস্ট খাবো, ওমলেট খাবো, চপ-কাটলেট-মাংস—ও, সেগুলো বুঝি এবেলা হয় না? আচ্ছা বেশ—চপ কাটলেটগুলো সন্ধ্যে-বেলায় এসেই খাওয়া যাবে তা হলে। এখন চা খাবো, কফি খাবো—

আমি বললুম, যদি আরো বেশি উৎসাহ পেতে চাস, তা হলে তোর কাপ-ডিস চামচে-কাঁটগুলোও খেতে পারি।

অভিলাষ দারুণ খুশি হতে যাচ্ছিলো, কিন্তু এবারে যেন একটু নার্ভাস হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বললে, না-না, কাপ ডিশগুলো বরং—

—তুই আপত্তি করছিস?—বলটুদা বললে, আচ্ছা, ওগুলো তবে থাক। আর যদ্দূর মনে হচ্ছে, কাপ-ডিশে খেতে খুব ভালো লাগবে

না, কাঁটা-চামচে খাওয়াও বেশ শক্ত হবে। তবে প্যালার যদি খুবই ইচ্ছে হয়ে থাকে, একটা ভাঙা পেয়ালা বরং ওকে দে—বসে বসে চিবোক। আর আমার জন্যে দু'খানা প্লাম কেক, চারটে টোস্ট, দুটো ডবল ডিমের ওম্‌লেট—

আমি ভীষণ প্রতিবাদ করে বললুম, না, আমি কক্ষনো ভাঙা কাপ খাবো না। আমিও কেক, টোস্ট ওম্‌লেট এসবই খেতে চাই।

অভিলাষ বললে, হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুইও খাবি। একটু বোস—আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

প্রায় নাচতে নাচতে চলে গেল অভিলাষ। বোধ হয় ভাবছিলো সকালে কার মুখ দেখেই উঠেছে আজকে। কম্‌সে কম তিন টাকা করে ছ'টাকার খদ্দের। কিন্তু আমি যদি বলটুদাকে চিনে থাকি তা হলে—

এদিকে বুড়ো ভদ্দরলোক উঠে যেতেই ছোঁ মেরে খবরের কাগজটা তুলে এনেছে বলটুদা। এক মনে খেলার খবর পড়ছে।

বললুম, বলটুদা—

—উঁ ?

—পকেটে টাকা-ফাকা আছে তো ? না তোমার পাল্লায় পড়ে ঠ্যাঙানি খাবো শেষ পর্যন্ত ?

বলটুদার নাকের ডগায় একটা মাছি অনেকক্ষণ ধরে পজিশন নেবার চেষ্টা করছিলো। খবরের কাগজের ঘা খেয়ে সেটা পালালো। বলটুদা আমার কথা শুনে উঁচুদরের একটা হাসি হাসলে—বাংলায় যাকে বলে হাই ক্লাস।

—কে ঠ্যাঙাবে ? অভিলাষ ? না—ও তেমন ছেলে নয়।

—তাই নাকি ?—আমার খট্‌কা তবুও যেতে চায় না। জিগ্যেস করলুম : কী করে জানলে ?

—ও যখন পটোলের দোকানে বসতো—জানিস তো ? সেই যখন দোকানের পটোল তোলার জো হয়েছিলো ? সেই সময় একদিন ও একা দোকানে বসে রয়েছে, দু'জন লোক এসে হাজির। একজন বললে, খোকা আমায় পটোলডাঙার টেনিদার বাড়িটা চিনিয়ে দিতে পারো ? ও বললে, ওই তো—বাটার দোকানের পাশ দিয়ে চলে যান। শুনে লোকটা বললে, আমি কলকাতায় নতুন এসেছি ভাই—পথ ঘাট কিছু চিনিনে। একটু আসবে সঙ্গে ? অভিলাষ বললে, আমি যে দোকানে একা আছি ! লোকটা বললে, তাতে কী—আমার সঙ্গের বন্ধুটি তোমার দোকান পাহারা দেবে। শুনে অভিলাষ তো তাকে এগিয়ে দিতে গেল। পাটালডাঙার গলিতে ঢুকেই লোকটা একদম ভ্যানিশ ! 'ও মশাই কোথায় গেলেন' বলে অভিলাষ একঘণ্টা ধরে চেঁচিয়ে, মিথ্যে গোরু খোঁজা করে, ফিরে এসে দেখে লোকটার সঙ্গীও নেই। আর নেই—

বললুম, কী নেই ?

বলটুদা বললে, এক ঝুড়ি পটোল। ভীষণ মন খারাপ করে অভিলাষ হিসেবের খাতায় লিখে রাখলে, 'সাত সের তেরো ছটাক পটোল কেহ বাকীতে লইয়া গেল। তাহার নাম ঠিকানা কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না।' আর সেই হিসেব দেখে ওর বাবা—

—ওর বাবা কী করলে ?

বলটুদা চোখ মিটমিট করে বললে, পরে বলবো। ওই যে, অভিলাষ আসছে।

সত্যিই অভিলাষ আসছে। নিজেই হাতে করে আনছে দুটো প্লেট। তাতে ডবল ডিমের ওমলেট, দুটো করে প্লাম কেক আর চারটে করে টোস্ট।

বলটুদা বললে, বাঃ—তোফা !—তারপর প্রায় অভিলাষের হাত

থেকে প্লেট কেড়ে নিয়েই খাওয়া শুরু করে দিলে। আর আহ্লাদী আহ্লাদী মুখ করে পাশে দাঁড়িয়ে রইলো অভিলাষ। কী খুশি!

—ওম্‌লেট কেমন হয়েছে, বলটুদা?

—খাসা। তোকে তো উৎসাহ দিতেই এলুম অভিলাষ! তোর ওম্‌লেট খেয়েই বুঝতে পারছি—তোর ভবিষ্যৎ কী নিদারুণ উজ্জ্বল!

অভিলাষের চোখ-মুখ চকচক করে উঠলো।—তাই নাকি?

—তবে আর বলছি কী? তোর রেস্তোরাঁ দিনের পর দিন ফেঁপে উঠবে, দেলখোসকে মেরে বেরিয়ে যাবে।

—সত্যি?—আনন্দে অভিলাষ বার দুই খাবি খেলো।

—তা ছাড়া কী? তার পর তোর রেস্তোরাঁ আরো বড়ো হবে—গ্র্যাণ্ড হোটেলকেও ছাপিয়ে উঠবে। গ্রেট্ ইস্টার্ণ, ফিরপোতে না গিয়ে দলে দলে লোক ছুটে আসবে তোর দোকানে। চ্যাংওয়ার চাউ চাউ হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকবে। আর তুই গদী আঁটা চেয়ারে বসে খালি টাকা গুণতে থাকবি।

বক্তৃতা আর খাওয়া সমানে চলছে বলটুদার। আমিও যতটা পারি চট্‌পট্ প্লেট সাফ করছি। কখন যে কী হয়ে যায় কিছুই তো বলা যায় না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খানিকক্ষণ নেচে নিলে অভিলাষ। তারপর দৌড়ে যেতে যেতে বলে গেল: বোসো, তোমাদের জন্যে ভালো করে ডবল কাপ চা নিয়ে আসি দুটো।

বলটুদা শেষ প্লাম কেকটা গোগ্রাসে গিলতে গিলতে বললে, কেমন বুঝছিস?

বললুম, ভালো নয়। পকেটে যদি টাকা না থাকে—

—টাকা? টাকা কী হবে? উৎসাহ দেবার শক্তি থাকলেই যথেষ্ট। দেখছিস না—এর মধ্যেই কেমন নাচতে শুরু করেছে অভিলাষ?

আর তাও ভেবে ছাখ প্যালা—ঝট্ করে কিরকম ওর রেস্তোরাঁটাকে গ্র্যাণ্ড হোটেলের চাইতেও বড়ো করে দিলুম। আর কী চাই ?

—মুখে বললেই তো হয় না ?

—মুখে বলবো না তো কান দিয়ে বলবো নাকি ? কান দিয়ে কি বলা যায় ? অবিশ্যি নাক দিয়ে কেউ কেউ ঘুমের সময় বলে বটে—কিন্তু কী যে বলে তা বোঝাই যায় না। বোধ হয় হিব্রু বলে। নাকি জার্মান ভাষা ? ঘুঁ-ঘুরুর—ঘুঁ-ঘুরুর—আচ্ছা, চীনে ভাষা না তো ? তোর কী মনে হয়, প্যালা ?

নাকের ডাকের ভাষাটা যে কী, তা বোঝবার আগেই অভিলাষ চা আনলে। কী মনে হয় তা আর বলতে পারলুম না।

আমি আর বলটুদা বেশ মন দিয়ে চা-টা শেষ করলুম। তারপর ধীরে সুস্থে গোটা দুই ঢেঁকুর তুলে বলটুদা উঠে দাঁড়ালো। আমিও তক্ষুণি একেবারে দোরগোড়ায়—এইবারে যা হওয়ার হবে—

বলটুদা বললে, জোর খাইয়েছিস। ছাখ্ না—বছর ঘুরতে না ঘুরতে তুই দেলখোসকে মেরে দিবি। তারপর ফিরপো—গ্রেট্ ইস্টার্ণ—

আনন্দে অভিলাষ হাঁসের মতো হাঁসফাঁস করতে লাগলো।

—তা হলে চলি—

—এই যে বিলটা—অভিলাষ একখানা কাগজ এগিয়ে ধরলো : পাঁচ টাকা বারো আনা—

—কিসের বিল ?—বলটুদা যেন আকাশ থেকে পড়লো।

আর অভিলাষ পড়লো—না, আকাশ থেকে নয়, সোজা স্পুট্নিক থেকে।

—বা রে, পাঁচ টাকা বারো আনার খেলে যে দুজনে মিলে !

বলটুদা বললে, মোটে পাঁচ টাকা বারো আনার ? তা হলে তো

তোর কাছে আরো চুয়াল্লিশ টাকা চার আনা পাওনা রইলো আমার।

অভিলাষ এবার স্পুট্‌নিক থেকে—না-না, সোজা চাঁদ থেকে পড়লো। পাঁচবার খাবি খেয়ে বললে, চুয়াল্লিশ টাকা চার আনা মানে? আমি আবার কবে তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছি? কক্ষনো না। তুমি এক পয়সাও পাওনা আমার কাছ থেকে।

—বটে? বসে বসে পঞ্চাশ টাকার উৎসাহ দিইনি এতক্ষণ? বলিনি—লেগে থাক অভিলাষ—শেষে গদী আঁটা চেয়ারে বসে টাকা গুণবি? সেই থেকে তো মোটে পাঁচ টাকা বারো আনা শোধ হলো।

অভিলাষ বললে, আঁ—আঁ—আঁ—

—আঁ—আঁ—আঁ নয়, বল—হাঁ—হাঁ—হাঁ। আর তোর হিসেবের খাতায় লিখে রাখ: 'কেহ পঞ্চাশ টাকা জমা দিয়া পাঁচ টাকা বারো আনার খাইয়া গেল। পরে ক্রমশঃ বাকীটা খাইবে।' আচ্ছা চলি, —টা—টা—

অভিলাষ কিছুই বলতে পারলে না—একেবারে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলো শুধু।

কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে আমার মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। বেচারা অভিলাষ! বলটুদার পাল্লায় পড়ে ওকে অমনভাবে ঠকানোটা একদম ঠিক হলো না—না খেলেই ভালো হতো বলটুদার সঙ্গে। কিন্তু আমি কি করতে পারি? আমার পকেটে তো মোটে তিনটে নয়া পয়সা ছাড়া কিছু নেই! যদি কোনোদিন যোগাড় করতে পারি, ওর টাকা আমি নিশ্চয় শোধ করে দেবো।

ভীষণ রাগ হলো বলটুদার ওপর। ট্রামে উঠতে যাচ্ছি—বলটুদা ঠ্যাং ধরে আমায় টেনে নামালো।

—কোথায় যাচ্ছিস?

—যাবো একবার বলাই ঢ্যাং লেনে।

—ও, আমাদের পাঁচুগোপালের বাড়িতে ? তা চল্—চল্। ওর ক্ষেমঙ্করী পিসিমা বেশ ভালো খাওয়ায়।

কী রাক্ষস দেখেছো ? এখুনি অভিলাষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে এতগুলো খেয়ে এসেছে। আবার এক্ষুণি খাই-খাই করছে !

বললুম, আজ গিয়ে সুবিধে হবে না। পাঁচুগোপাল ফুটবল খেলতে গিয়ে পা মচকে পড়ে আছে।

—পা মচকে পড়ে আছে ? আহা, চুক-চুক ! তা হলে তো ওকে উৎসাহ দেবার জন্যে আরো বেশী করে যাওয়া দরকার। চল্—চল্—

একটা হ্যাঁচকা টানে বলটুদা আমায় ট্রামে তুলে ফেললে।

পাঁচুগোপালের বাড়ি গিয়ে কড়া নাড়তে ওর ক্ষেমঙ্করী পিসিমা দরজাটা খুলে দিলে। বলটুদা সঙ্গে সঙ্গে এক মুখ দাঁত বের করে ফেললে। গলেই গেল বলতে গেলে।

—পাঁচু কেমন আছে, দেখতে এলুম পিসিমা।

ক্ষেমঙ্করী পিসিমা ভারী খুশি হলেন : আহা বাবা, আয়---আয়। বাছা আমার আজ দু'দিন থেকে মন মরা হয়ে শুয়ে আছে।

---সেই জন্যেই তো এলুম। শরীর খারাপ বলেই তো ওকে ভালো করে উৎসাহ দেওয়া দরকার।

—তাই দে, বাবা। আমি তোদের জন্যে ক'টা তালের বড়া ভেজে আনি।

সত্যিই তালের বড়ার গন্ধে বাড়ি ম-ম করছিলো। বলটুদা মুখটাকে ছুঁচোর মতো ছুঁচোলো করে চুপি চুপি বললে, দেখলি তো প্যালা—হুঁ-হুঁ ! কেমন প্রেমসে গরম গরম তালের বড়া খাওয়া যাবে। কপাল ভালো থাকলে এমনিই হয়। এখন চল্ দেখি—পেঁচোটা কী করছে।

পায়ে চুন হলুদ মাখিয়ে পাঁচুগোপাল প্যাঁচার মতো পড়ে আছে। বলটুদা গিয়ে থপাস করে তার পাশে বসে পড়লো।

—কিরে পেঁচো, কেমন আছিস?

পাঁচু চিঁ-চিঁ করে বললে, ভীষণ ব্যথা।

—ভীষণ ব্যথা?—বলটুদা উৎসাহ দিতে লাগলো: অমন হয়। ব্যথা হতে হতে শেষে সেপ্‌টিক হয়ে যায়।

পাঁচুগোপাল ভীষণ ঘাবড়ে গেল: মচ্‌কানি থেকে সেপ্‌টিক!

—হয় বই কি। অনেক সময় পা কেটে ফেলতে হয়—কত লোকে মরেও যায় আবার।

পাঁচুগোপালের চোখ কপালে চড়ে গেল: অ্যাঁ—আমি তবে মারা যাবো নাকি?

উৎসাহ দিয়ে বলটুদা বলতে লাগলো: যেতে পারিস—কিছু অসম্ভব নয়। তবে মারা না-ও যেতে পারিস—মানে, মনে জোর থাকলে বেঁচে গেলেও বেঁচে যেতে পারিস। তবে একটা পা কাটা গেলেও ঘাবড়াসনি। না হয় লাঠি ভর করেই হাঁটবি। আর যদি মারাই যাস্—মনে কর, মারাই গেলি—তা হলেও ঘাবড়ে যাসনি। দেখিস্ পেঁচো—বলটুদা আরো বেশি উৎসাহ দিতে লাগলো: তোর মৃত্যুর পর আমরা কিরকম একখানা শোকসভা—

বলটুদা আর বলতে পারলো না—শব্দ হলো ঝপাং! 'বাপ্‌-বাপ্‌' বলটুদা লাফিয়ে উঠলো।

ক্ষেমঙ্করী পিসিমার ঝাঁটা আবার নামলো বলটুদার পিঠে। পিসিমা যে কখন ঘরে এসে ঢুকেছে আমরা দেখতেই পাইনি।

বিকট রকম দাঁত খিঁচিয়ে ক্ষেমঙ্করী পিসিমা আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগলো: তবে রে অলপ্পেয়ে—নচ্ছার, ড্যাকড়া, হাড়হাবাতে!

আমার পাঁচুর ঠ্যাং কাটা যাবে? আমার পাঁচু মারা যাবে? তার আগে তোরই মরণ ঘনিয়েছে—দেখে নে!

আবার ঝাঁটা নামলো: ঝপাং—ঝপাং—

—বাবারে গেছি—গেছি—বলে বলটুদা ছুটলো। পেছনে ছুটলো ঝাঁটা হাতে ক্ষেমঙ্করী পিসিমা। কী আর করা—আমাকেও ছুটতে হলো সঙ্গে সঙ্গে।

সন্ধ্যেবেলা গেছি বলটুদার বাড়িতে। গায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে পড়ে আছে বলটুদা। ঝাঁটার ঘায়ে বলটুদাকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে ক্ষেমঙ্করী পিসিমা। উৎসাহ দেবার পালা আমার এবার।

বললুম, কিছু ভেবোনা বলটুদা। ঝাঁটার ঘায়ে যদি সারা গা সেপ্‌টিক হয়ে যায়—যদি তুমি মারাই যাও, তা হলেও কিছু চিন্তা কোরো না। অভিলাষের দোকানে তোমার যে চুয়াল্লিশ টাকা চার আনা পাওনা আছে—সেটা আমিই খেয়ে আসবো এখন।

কিন্তু বলটুদা একদম উৎসাহ পেলো না। চেঁচিয়ে আমায় গাল দিতে লাগলো: বেরো—বেরো এখান থেকে! উল্লুক—ভল্লুক—শল্লকী—পক্কবিল্ব—অম্লজান কোথাকার—

কী ছোটলোক—দেখেছো?

টিক্‌টিকির ল্যাজ

ক্যাবলাদের বসবার ঘরে বসে রেডিয়োতে খেলার খবর শুনছিলুম আমরা। মোহনবাগানের খেলা। আমি, টেনিদা আর ক্যাবলা খুব মন দিয়ে শুনছিলুম, আর থেকে থেকে চিৎকার করছিলুম—গো-গো—গোল। দলের হাবুল সেন হাজির ছিলো না—সে আবার ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার। মোহনবাগানের খেলায় হাবলার কোনো ইণ্টারেস্ট নেই।

কিন্তু চেঁচিয়েও বেশি সুবিধে হলো না—শেষ পর্যন্ত একটা পয়েণ্ট। আমাদের মন-মেজাজ এমনি বিচ্ছিরি হয়ে গেল যে, ক্যাবলার মা'র নিজের হাতে তৈরী গরম গরম কাটলেটগুলো পর্যন্ত খেতে ইচ্ছে করছিলো না। এই ফাঁকে টেনিদা আমার প্লেট থেকে একটা কাটলেট পাচার করলো—মনের দুঃখে আমি দেখেও দেখতে পেলুম না।

কিছুক্ষণ উদাস হয়ে থেকে ক্যাবলা বললে, দ্যুৎ!

আমি বললুম, হুঁ!

টেনিদা হাড়-টাড় সুদ্ধ চিবিয়ে কাটলেটগুলো শেষ করলো, তারপর কিছুক্ষণ খুব ভাবুকের মতো চেয়ে রইলো সামনের দেয়ালের দিকে। একটা মোটা সাইজের টিক্‌টিকি বেশ একমনে কুপ-কুপ করে পোকা খাচ্ছিল, তাকে লক্ষ্য করতে করতে টেনিদা বললে, ওই যে!

আমি জিজ্ঞেস করলুম, ওই যে, কী?

—মোহনবাগান।

—মোহনবাগান মানে?

—টিক্‌টিকি। মানে টিক্‌টিকির ল্যাজ।

শুনে আমি আর ক্যাবলা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম, খবর্দার টেনিদা, মোহনবাগানের অপমান কোরো না!

টেনিদা নাক-টাক কুঁচকে মুখটাকে পাঁপর ভাজার মতো করে বললে, আরে খেলে যা! বললুম কী, আর কী বুঝলো এ ছুটো!

—এতে বোঝবার কী আছে শুনি! তুমি মোহনবাগানকে টিকৃটিকির ল্যাজ বলছো—

—চুপ কর প্যালা—মিথ্যে কুরুবকের মতো বকৃবক্ করিস নি। যদি বাবা কচুবনেশ্বরের কথা জানতিস তা হলে বুঝতিস—টিকৃটিকির রহস্য কী!

—কচুবনেশ্বর। সে আবার কী? এবার ক্যাবলার জিজ্ঞাসা।

—সে এক অত্যন্ত ঘোরালো ব্যাপার। যাকে ফরাসী ভাষায় বলে পুঁদিচ্চেরী!

—পুঁদিচ্চেরী তো পণ্ডিচেরী! সে তো একটা জায়গার নাম।—ক্যাবলা প্রতিবাদ করলো।

—শাট আপ! জায়গার নাম। টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, ভারী ওস্তাদ হয়ে গেছিস যে! আমি বলেছি যে, পুঁদিচ্চেরী মানে ব্যাপার অত্যন্ত সাংঘাতিক—ব্যস! এ নিয়ে তক্কো করবি তো এক চড়ে তোর কান—

আমি বললুম—কানপুরে উড়ে যাবে!

—রাইট!—টেনিদা গম্ভীর হয়ে বললে, এবার তা হলে বাবা কচুবনেশ্বরের কথাটা বলি। ঠাকুর-দেবতার ব্যাপার, খুব ভক্তি করে শুনবি। যদি তক্ক-টক্ক করিস তা হলে—

আমরা সমস্বরে বললুম—না—না।

টেনিদা শুরু করলো।

সেবার গরমের ছুটিতে সেজো পিসীমার কাছে বেড়াতে গেছি ঘুঁটে পুকুরে। খাসা জায়গা! গাছে গাছে আম, জাম, কাঁঠাল, কলা—

আমি বললুন—আহা, শুনেই যে লোভ হচ্ছে। ঘুঁটেপুকুরটা কোথায় টেনিদা?

ক্যাবলা ব্যাজার হয়ে বললে—আঃ, গল্প থামিয়ে দিস্ নে। ঘুঁটেপুকুর কোথায় হবে আবার ? নিশ্চয় গোবরডাঙার কাছাকাছি।

টেনিদা বললে—না, গোবরডাঙার কাছে নয়। রাণাঘাট ইস্টিশন থেকে বারো মাইল দূরে। দিব্যি জায়গা রে ! চারদিকে বেশ শ্যামল প্রান্তর-টান্তর—পাখীর কাকলি-টাকলি কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু তারো চাইতে বেশি আছে আম, জাম, কাঁঠাল, কলা। খেয়ে খেয়ে আমার গা থেকে এমনি আম-কাঁঠালের গন্ধ বেরুতো যে, রাস্তায় আমার পেছনে পেছনে আট-দশটা গরু বাতাস শুঁকতে শুঁকতে হাঁটতে থাকত। একদিন তো—কিন্তু না, গরুর গল্প আজ আর নয়—বাবা কচুবনেশ্বরের কথাই বলি।

হয়েছে কি জানিস্, আমি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুঁটেপুকুর ফুটবল ক্লাব তো আমায় লুফে নিয়েছে। আমি পটলডাঙার থাণ্ডার ক্লাবের ক্যাপ্টেন—একটা জাঁদরেল সেন্টার ফরোয়ার্ড—সেও ওদের জানতে বাকী নেই।

দু দিন ওদের সঙ্গে খেলেই বুঝতে পারলুম—ওদের নাম হওয়া উচিত ছিলো বাতাবি নেবু স্পোর্টিং ক্লাব। মানে বাতাবি নেবু পর্যন্তই ওদের দৌড়, ফুটবলে পা ছোঁয়াতে পর্যন্ত শেখে নি। কিছুদিন তালিম-টালিম দিয়ে এক রকম দাঁড় করানো গেল। তখন ঘুঁটেপুকুরে পাঁচুগোপাল কাপের খেলা চলছিলো। বললে বিশ্বাস করবি নে, আমার তালিমের চোটে ঘুঁটেপুকুর ক্লাব তিন তিনটে গেঁয়ো টিমকে হারিয়ে দিয়ে একেবারে ফাইন্যালে পৌঁছে গেল। অবিশ্যি সব ক'টা গোল আমিই দিয়েছিলুম।

ফাইন্যালে উঠেই ল্যাঠা বাধলো।

ওদিক থেকে উঠে এসেছে চিংড়িহাটা হিরোজ—মানে এ তল্লাটের সব চেয়ে জাঁদরেল দল। তাদের খেলা আমি দেখেছি। এদের মতো আনাড়ী নয়—এক-আধটু খেলতে-টেলতে জানে। সব চেয়ে

মারাত্মক ওদের গোল-কীপার বিল্‌টে ঘোষ। বল তো দূরের কথা, গোলের ভেতরে মাছি পর্যন্ত ঢুকতে গেলে কপাৎ করে লুফে নেয়। আর তেমনি তাগড়াই জোয়ান—কাছে গিয়ে চার্জ-ফার্জ করতে গেলে দাঁত-মুখ আস্ত নিয়ে ফিরতে হবে না।

স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, ঘুঁটেপুকুরের পক্ষে পাঁচুগোপাল কাপ নিতান্তই মরীচিকা!

ঘুঁটেপুকুর ক্লাব চুলোয় যাক—সেজন্যে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আমি টেনি শর্মা, খাস পটলডাঙা থাণ্ডার ক্লাবের ক্যাপ্‌টেন—আসল কলকাতার ছেলে, আমার নাকের সামনে দিয়ে চিংড়িহাটা ড্যাং-ড্যাং করতে করতে কাপ নিয়ে যাবে! এ অপমান প্রাণ থাকতে সহ্য করা যায়? তার ওপর এক মাস ধরে ঘুঁটেপুকুরের আম-কাঁঠাল এন্‌তার খেয়ে চলেছি—একটা কৃতজ্ঞতাও তো আছে?

কিন্তু কী করা যায়!

দুপুরবেলা বসে বসে এই সব ভাবছি, এমন সময় শুনতে পেলুম, সেজো পিসীমা কাকে যেন বলছেন—বসে বসে ভেবে আর কী করবে—বাবা কচুবনেশ্বরের থানে গিয়ে ধন্না দাও।

কচুবনেশ্বর! ওই বিটকেল নামটা শুনেই কান খাড়া করলুম।

সেজো পিসীমা আবার বললেন—বাবার থানে ধন্না দাও—জাগ্রত দেবতা—তোমার ছেলে নির্ঘাৎ পরীক্ষায় পাশ করে যাবে।

গলা বাড়িয়ে দেখলুম, পিসীমা দত্ত-গিন্নীর সঙ্গে কথা কইছেন। দত্ত-গিন্নী বললেন—তা হলে তাই করবো, দিদি। হতচ্ছাড়া ছেলে দু-বার পরীক্ষায় ডিগবাজী খেলে, উনি বলেছেন এবারেও ফেল করলে লাঙলে জুড়ে চাষ করাবেন।

দত্ত-গিন্নীর ছেলে চাষ করুক—আমার আপত্তি নেই, কিন্তু বাবা কচুবনেশ্বরের কথাটা কানে লেগে রইলো। আর দত্ত-গিন্নী বেরিয়ে যেতে না যেতেই আমি পিসীমাকে পাকড়াও করলুম।

—বাবা কচুবনেশ্বর কে পিসীমা ?

শুনেই পিসীমা কপালে হাত ঠেকালেন। বললেন—দারুণ জাগ্রত দেবতা রে! গাঁয়ের পূব দিকে কচুবনের মধ্যে তাঁর থান। পয়লা শ্রাবণ ওখানে মোচ্ছব হয়—কচু সেদ্ধ, কচু ঘণ্ট, কচুর ডালনা, কচুর অম্বল, আর কচুর পোলাও দিয়ে তাঁর ভোগ হয়।

টেনিদার গল্প শুনতে শুনতে আমার জানতে ইচ্ছে হলো, কচুপোড়াটাই বা বাদ গেল কেন। কিন্তু ঠাকুর-দেবতাদের কচুপোড়া খেতে বললে নিশ্চয় তাঁরা চটে যাবেন—তাই ব্যাপারটা চেপে গেলুম। জিজ্ঞেস করলুম, কচুর পোলাও খেতে কেমন লাগে টেনিদা!

টেনিদা খ্যাঁক-খ্যাঁক করে বললে—আঃ, কচু খেলে যা! আমি কি কচুর পোলাও খেয়েছি নাকি যে বলবো! ইচ্ছে হয় পয়লা শ্রাবণ ঘুঁটেপুকুরে গিয়ে খেয়ে আসিস।

ক্যাবলা অধৈর্য হয়ে বললে, টিক-টিক করিস নে প্যালা, গল্পটা বলতে দে। তুমি থেমো না টেনিদা, চালিয়ে যাও।

টেনিদা বললে, সেজো পিসীমার ভক্তি দেখে আমারও দারুণ ভক্তি হলো। আর ভেবে ছাখ—কচু সেদ্ধ, কচু ঘণ্ট, কচুর অম্বল, কচুর কালিয়া—মানে এত কচু ম্যানেজ করা চাট্টিখানি কথা! আমার তো কচু দেখলেই গলা কুট্-কুট্ করে। কচু ভোগের বহর দেখে মনে হলো, দেবতাটি তো তবে সামান্যি নয়!

জিজ্ঞেস করলুম—বাবা কচুবনেশ্বরের কাছে ধর্ণা দিয়ে ফুটবল ম্যাচ জেতা যায়, পিসীমা ?

পিসীমা বললেন—ফুটবল ম্যাচ বলছিস কি ? বাবার অসাধ্য কাজ নেই! এই তো, ও বাড়ির মেন্টির মাথায় এমন উকুন হলো যে, তিনবার ন্যাড়া করে দিয়েও উকুন যায় না। কত মারা হলো, কত কবিরাজী তেল—উকুন যে কে সেই! শেষে মেন্টির মা কচুবনেশ্বরের থানে ধন্না দিলে। আধ ঘণ্টা চুপ করে পড়ে থেকেছে—

ব্যস,—হাতে টুপ করে কিসের একটা শেকড় পড়লো। সেই শেকড় বেটে লাগিয়ে দিতেই একদিনে উকুন ঝাড়ে-বংশে সাফ। আর মেন্টির যা চুল গজালো—সে যদি দেখতিস! একেবারে হাঁটু পর্যন্ত!

আমি তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠলুম। বললুম—বাবার থান কোন্ দিকে পিসীমা?

—ওই তো সোজা পুব দিক বরাবর—একেবারে নদীর ধারেই। কচুবনের ভেতরে বাবার থান, অনেক দূর থেকেই তো দেখা যায়। তুই সেখানে ধন্না দিতে যাবি নাকি রে? তোর আবার কী হলো?

—কিছু হয় নি—বলে—সোজা পিসীমার সামনে থেকে চলে এলুম। মনে মনে ঠিক করলুম, কাউকে জানতে দেওয়া নয়—চুপি চুপি একাই গিয়ে ঘণ্টাখানেক ধর্ণা দেবো। একটা শেকড়-টেকড় যদি পেয়ে যাই—বেটে খেয়ে নেবো, তারপর কালকের খেলায় আমাকে আর পায় কে? ওই ডাকসাইটে বিল্টে ঘোষের হাতের তলা দিয়েই তিন তিনখানা গোল ঢুকিয়ে দেবো।

একটু পরেই রামায়ণ খুলে সুর করে 'সূর্পনখার নাসাচ্ছেদন' পড়তে পড়তে পিসীমা যেই ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি সোজা একেবারে কচুবনেশ্বরের খোঁজে বেরিয়ে পড়লুম।

বেশি হাঁটতে হলো না। আমবাগানের ভেতর দিয়ে সিকি মাইলটাক যেতেই দেখি সামনে একটা মজা নদী আর তার পাশেই কচুর জঙ্গল। সে কি জঙ্গল! দুনিয়াসুদ্ধ সব লোককে কচু ঘণ্ট খাইয়ে দেওয়া যায়—কচুপোড়া খাওয়ানোও শক্ত নয়, এমন বন সেখানে। আর তারই মাঝখানে একটা ছোট মন্দিরের মতো—বুঝলুম ওইটেই হচ্ছে বাবার থান।

বন ঠেলে তো মন্দিরে পৌছানো গেল। কচুর রসে গা একটু চিড়বিড় করছিলো—কিন্তু ওটুকু কষ্ট না করলে কি আর কেষ্ট মেলে! গিয়ে দেখি, মন্দিরে মূর্তি-টুর্তি নেই—একটা বেদী, তার ওপর গোটা

কয়েক রং চটা নয়া পয়সা, কিছু চাল, আর একরাশ কচুর ফুল শুকিয়ে রয়েছে। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মন্দিরের বারান্দায় ধর্ণা দিলুম।

চোখ বুজে লম্বা হয়ে শুয়ে আছি। হাত দুটো মেলেই রেখেছি—কোন্ হাতে টুপ করে বাবার দান পড়বে বলা যায় না তো। পড়ে আছি তো আছিই—একরাশ মশা এসে পিন-পিন করে কামড়াচ্ছে—কানের কাছে গোটা দুই গুবরেপোকা ঘুরঘুর করছে, কচু লেগে হাত-পা কুট্‌কুট্ করছে। কিন্তু মশা তাড়াচ্ছি না, গা চুলকোচ্ছি না, খালি দাঁত-মুখ শিঁটিয়ে প্রাণপণে প্রার্থনা করছি—দোহাই বাবা কচুবনেশ্বর, একটা শেকড়-টেকড় চট্‌পট্ ফেলে দাও—চিংড়িহাটার বিল্টে ঘোষকে ঠাণ্ডা করে দিই। বেশি দেরী করো না বাবা—গা হাত ভীষণ চুলকোচ্ছে, আর দারুণ মশা! আর তা ছাড়া থেকে থেকে বনের ভেতর কী যেন খ্যাঁক-খ্যাঁক করে ডাকছে—যদি পাগলা শেয়াল হয় তা হলে এক কামড়েই মারা যাবো। দোহাই বাবা, দেরী করো না—যা দেবার দিয়ে দাও, কুইক্—কচুবনেশ্বর।

যেই বলেছি অমনি বাঁ হাতে কী যেন টপাস্ করে পড়লো।

'ইউরেকা' বলে যেই লাফিয়ে উঠেছি—দেখি, শেকড়ের মতোই কী একটা পড়েছে বটে! কিন্তু এ কি! শেকড়টা তুরুক্ তুরুক্ করে অল্প অল্প লাফাচ্ছে যে!

মন্ত্রপূত জ্যান্ত শেকড় নাকি?

আর তখুনি মাথার ওপর ট্যাক্-ট্যাক্-টিকিস করে আওয়াজ হলো। দেখি, দুটো টিক্‌টিকি দেওয়ালের গায়ে লড়াই করছে—তাদের একটার ল্যাজ নেই। মানে, মারামারিতে খসে পড়েছে।

রহস্যভেদ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। তাহলে আমার হাতে শেকড় পড়ে নি—পড়েছে টিক্‌টিকির কাটা ল্যাজ! টিপে দেখলুম রবারের মতো—আর অল্প অল্প নড়ছে তখনো।

দুর্বুদ্ধি হলে যা হয়—ভীষণ রাগ হয়ে গেল আমার! মনে হলো,

বাবা কচুবনেশ্বর আমায় ঠাট্টা করলে। এতক্ষণ গায়ের কুটকুটুনি আর মশার কামড় সহ্য করে শেষে কিনা টিক্‌টিকির ল্যাজ! গোঁ গোঁ করে উঠে পড়লুম। তক্ষুণি আবার সেই শেয়ালটা খ্যাঁক্‌-খ্যাঁক্‌ করে ডেকে উঠলো—মনে হলো এখানে থাকাটা আর ঠিক নয়। মন্দির থেকে নেমে কচুবন ভেঙে সোজা বাড়ী চলে এলুম—আধসের সর্ষের তেল মেখে এক ঘণ্টা পরে পায়ের জ্বলুনি খানিকটা বন্ধ হলো'।

টেনিদা এই পর্যন্ত বলতে আমি আর ধৈর্য রাখতে পারলুম না। ফস্‌ করে জিজ্ঞেস করলুম—সেই টিক্‌টিকির ল্যাজটা কী হলো?

—আঃ থাম না—আগে থেকে কেন বাগড়া দিচ্ছিস? ফের যদি কথা বলবি, তা হলে দেওয়ালের ওই টিক্‌টিকিটা পেড়ে তোর মুখে পুরে দেবো—বলে টেনিদা আমার দিকে বজ্রদৃষ্টিতে তাকালো।

ক্যাবলা বললে—ছেড়ে দাও ওর কথা, তুমি বলো।

—বলবার আর আছে কী!—টেনিদা দীর্ঘশ্বাস ফেললোঃ ভুল যা হয়ে গেলো, তার শাস্তি পেলুম পরের দিনই।

ইস্কুলের মাঠে পাঁচুগোপাল কাপের ফাইন্যাল ম্যাচ। ঘুঁটেপুকুর ক্লাবকে বলেছি, প্রাণ দিয়েও কাপ জিততে হবে। আর সত্যি কথা বলতে কি—বাতাবি নেবু স্পোর্টিং আজ সত্যিই ভালো খেলছে—। এমন কি আমরা হয়তো দু'একটা গোলও দিয়ে ফেলতে পারতুম—যদি ওই দুরন্ত-দুর্ধর্ষ বিল্‌টে ঘোষটা না থাকত। আমাদের গোল-কীপার প্যাঁচাও খুব ভালো খেলছে—দু-দুবার যা সেভ্‌ করলে, দেখবার মতো।

হাফ টাইম পর্যন্ত ড্র। কিন্তু বুঝতে পারছিলুম—ঘুঁটেপুকুরের দম ফুরিয়ে আসছে, পরের পঁচিশ মিনিট ঠেকিয়ে রাখা শক্ত হবে। হাফ টাইম হওয়ার আগেই আমি একটা মতলব এঁটে ফেলেছিলুম। মাঠের ধারে বাদাম গাছ থেকে হাওয়ায় শুকনো পাতা উড়ে উড়ে পড়ছিলো, তাই দেখেই প্ল্যানটা এলো। মানে মতলবটা মন্দ নয়। কিন্তু জানিস্‌ তো, 'মারি অরি পারি যে কৌশলে!'

হাফ টাইম হতেই সেজো পিসীমার বাড়ীর রাখাল ভেট্‌কীর কানে কানে আমি একটা পরামর্শ দিলুম। ভেট্‌কীটা দেখতে বোকা-সোকা হলেও বেশ কাজের ছেলে। শুনেই একগাল হেসে সে দৌড় মারলো।

আবার খেলা আরম্ভ হলো। হাওয়ায় বাদামের পাতা উড়ে আসছে, আমি আড়চোখে তা দেখছি আর ভাবছি ভেট্‌কী কখন আসে। এর মধ্যে চিংড়িহাটা আমাদের দারুণ চেপে ধরেছে—জান কবুল করে বাঁচাচ্ছে প্যাঁচা! আমিও ফাঁক পেলে ওদের গোলে হানা দিচ্ছি···কিন্তু বিল্‌টে ঘোষটা যেন পাঁচিল হয়ে গোল আটকাচ্ছে!

আমি শুধু ভাবছি···ভেট্‌কী গেল কোথায়?

অনেক দূর থেকে একটা বল গড়াতে গড়াতে আমাদের গোলের দিকে চলেছিলো। একটা করে আঙুল আল্‌তো করে ছুঁইয়েও তাকে ঠেকানো যায়। কিন্তু এ কী ব্যাপার! হঠাৎ প্যাঁচা হালদার দারুণ চীৎকার ছেড়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠলো—প্রাণপণে পা চুলকোতে লাগলো, আর সেই ফাঁকে—

সোজা গোল!

শুধু প্যাঁচা হালদার? ফুল ব্যাক্‌ কুচো মিত্তির লাফাতে লাফাতে সেই যে বেরিয়ে গেল, আর ফিরলোই না। প্যাঁচা সমানে পা চুলকোতে লাগলো, আর পর পর আরো চারটে গোল। মানে, ফাঁকা মাঠেই গোল দিয়ে দিলে বলা যায়!

হয়েছিলো কি জানিস? ভেট্‌কীকে বলেছিলুম, গাছ থেকে একটা লাল পিঁপড়ের বাসা ছিঁড়ে এনে উড়ো পাতার সঙ্গে ওদের গোলের দিকে ছেড়ে দিতে—তা হলেই বিল্‌টে ঘোষ একেবারে ঠাণ্ডা! ভেট্‌কী দৌড়ে গেছে, বাসাও এনেছে—কিন্তু ওটা এমন বেল্লিক যে, হাফ টাইমে যে সাইড বদল হয় সে আর খেয়ালই করে নি! একেবারে প্যাঁচা হালদারের গায়েই ছেড়ে দিয়েছে। যখন টের পেয়েছে, তখন আর—

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টেনিদা থামলো।

—কিন্তু কচুবনেশ্বরের টিক্‌টিকির ল্যাজ ?—আমি আবার কৌতূহল প্রকাশ করলুম।

—আরে, আসল দুঃখু তো সেইখানেই। চিংড়িহাটা যখন কাপ নিয়ে চলে গেল, তখন পরিষ্কার দেখলুম ওদের ক্যাপ্‌টেন বিল্‌টে ঘোষের কালো প্যান্টে একটা নীল তাপ্পিমারা।

—তাতে কী হলো ?—ক্যাবলা জিজ্ঞেস করলে।

—তাইতেই সব। নইলে কি ভেট্‌কীটা এমন ভুল করে, বিল্‌টের বদলে প্যাঁচার গায়ে পিঁপড়ের বাসা ছেড়ে দেয়! সবই সেই বাবা কচুবনেশ্বরের লীলা।

—কিছুই বুঝতে পারলুম না—হাঁ করে চেয়ে রইলুম টেনিদার মুখের দিকে।

আর টেনিদা খপ্‌ করে আমার মুখটা চেপে বন্ধ করে দিয়ে বললে, আরে, বাবার থান থেকে বেরিয়েই দেখি সামনে নদীর ধারে দড়ি টাঙিয়ে ধোপারা জামা-কাপড় শুকোতে দিয়েছে। হাতে টিক্‌টিকির ল্যাজটা তখনো ছিলো—কী ভেবে আমি সেটাকে একটা কালো প্যান্টের পকেটে গুঁজে দিয়েছিলুম আর সেই প্যান্টটায় নীল রঙের একটা তাপ্পিমারা ছিলো।

আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো টেনিদা। আর মাথার ওপরে টিক্‌টিকিটা ডেকে উঠলো : টিকিস্‌-টিকিস্ ঠিক ঠিক!

দুর্যোধনের প্রতিহিংসা

দুর্যোধন মণ্ডল খালিশপুরের হাটে গরু বিক্রী করতে যাচ্ছিলো।

যাচ্ছিলো ভালোই—বেশ খুশিমনে। গরুটা দু'বেলায় তিন সের দুধ দেয়—বিক্রী করে মোটা টাকা আসবে। সেই টাকা দিয়ে চাষের কাজের জন্যে একটা দামড়া বাছুর কিনবে, কিছু বাড়তি পয়সাও হাতে থাকবে তার। হাট ভালোই হবে, একটা পাঁটাও কেনা যেতে পারে। বহুদিন আশ মিটিয়ে মাংস খাওয়া হয় নি।

গ্রাম থেকে মাইল চারেক হেঁটে শিলাই নদী। এখন শুকনোর সময়—নদীতে বুক পর্যন্ত ডোবে। দুর্যোধন গরুর পিঠে চেপেই নদী পার হয়ে গেল। খালিশপুরের হাট আর ক্রোশখানেক মাত্র।

কিন্তু নদী পার হয়েই বাধলো গণ্ডগোল। শিলাইয়ের খেয়া-ঘাটের মাঝি গোবরা এসে খপ্‌ করে কাঁধটা চেপে ধরলো তার।

—বলি, ও মোড়লের পো, গুটি-গুটি পায়ে পাল চ্ছো যে বড়ো?

দুর্যোধন চটে গিয়ে বললে, পালাবো ক্যানে—অ্যা? কার চুরি করিছি যে পালাবো?

গোবরা একটা টকটকে লাল শালুর ফালি যোগাড় করে তাই দিয়ে পেল্লায় পাগড়ী বেঁধেছে মাথায়। আর সেই পাগড়ী বেঁধেই তার মেজাজ একেবারে আদালতের পেয়াদার মতো সপ্তমে চড়ে উঠেছে।

—চুরি করোনি তো কী?—গোবরা খ্যাঁক-খ্যাঁক করে বললে, খেয়ার পয়সা না দিয়েই সটকাচ্ছ?

—খেয়ার পয়সা!—দুর্যোধন আকাশ থেকে পড়লো: গরুর পিঠে চড়ে পার হইছি, তোমার নায়ে পা-ও তো ঠেকাই নি। পয়সা দেবো ক্যানে?

—নদী পেরুলেই পয়সা দিতে হবে—তা তুমি গরুতে চেপেই যাও, কি ডানা মেলে উড়েই যাও। নইলে গরু আটকে রাখবো—এই সাফ কথা বলে দেলাম।

গোবরা ষণ্ডা লোক, দুর্যোধন প্যাঁকাটির মতো রোগা। কাজেই পয়সা না দিয়ে পার পাওয়া গেল না। গুণে-গুণে চারটে পয়সা নিয়ে, সেগুলোকে ভালো করে দেখে গোবরা দুর্যোধনকে ছেড়ে দিলে। আর ঠাট্টা করে বললে, ভেবেছিলে চালাকি করে পেলিয়ে যাবে—হুঁ হুঁ! তুমি তো তুমি—ঘাটের পয়সা না দিয়ে একটা মাছি পর্যন্ত পেরুতে পারবেকঁনি, এইটেই মনে করিয়ে দিচ্ছি!

চারটে পয়সা গেল, সেটা বড়ো কথা নয়—অপমানটা বিঁধলো তার চাইতেও বেশি। রাগে দুর্যোধনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলতে লাগলো। এমন কি মাথাটা চিড়বিড়ও করতে লাগলো, মনে হলো কেউ সেখানে লঙ্কাবাটা ঘষে দিয়েছে। বড্ড বাড় বেড়েছে গোবরাটা। মানুষকে আর সে গণ্যিই করে না! কিন্তু লোকটাকে কিছু বলবারও জো নেই। ইয়া তাগড়াই জোয়ান—বেশি চ্যাঁ-ভ্যাঁ করতে গেলে এক চড়ে দাঁত কপাটি লাগিয়ে দেবে!

হুঁকোর মতো মুখ করে দুর্যোধন খালিশপুরের হাটে গেল।

প্রথমেই এক ঠোঙা গরম গরম জিলিপি কিনে খেলে, কিন্তু রাগের চোটে জিলিপিগুলো চিরতার মতো তেতো লাগলো। কচুরি খেতে গিয়ে মনে হলো কচুপোড়া খাচ্ছে—তাও বুনো কচু—গলার ভেতরে কুটুর কাটুর করে কামড়াচ্ছে।

ময়রাকে বললে, এসব কি খাবার করেছো হে? মুখে দেওয়া যায় না যে একটুও?

ময়রা রেগে বললে, হাটসুদ্ধ খেয়ে 'সাবাস সাবাস' বলছে, আর তোমারই পছন্দ হলো নি? বলি, মুখখানা কি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে এয়েচো? দোকানে বসে মিছে বদনাম কোরোনি।

গরুটা তখন চোখ বুজে শালপাতার ঠোঙা চিবুচ্ছিলো—তার নড়বার ইচ্ছে ছিলো না। মেঠাইগুলো দুর্যোধনের যেমনই লাগুক, গরুটার কিন্তু অমৃত মনে হচ্ছিলো।—আর খেতে হবেনি এই ছোটলোকটার ঠোঙা। বলে গরুটাকে এক চড় লাগিয়ে দুর্যোধন সেটাকে টানতে টানতে গো-হাটায় নিয়ে গেল।

মেজাজ চড়েই ছিলো, দু'চারজন খদ্দেরের সঙ্গে গোড়ার দিকে খিটিমিটিই হয়ে গেল খানিকটা। শেষে একজন যখন নগদ পঞ্চাশ টাকায় গরুটা কিনে নিলে, তখন দুর্যোধন একটু শান্ত হলো। হাট করলো, মস্ত একটা বোয়াল মাছ কিনলো। পাঁটাও কিনবার ইচ্ছে ছিলো, তারপরেই মনে হলো, গোবরা হয়তো পাঁটার পারানি বাবদ দু'আনা পয়সাই আদায় করে নেবে। বিশ্বাস নেই ওকে।

একটা বটগাছতলায় বসে গায়ের গামছাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খাচ্ছিলো দুর্যোধন। বেলাবেলিই হাট হয়ে গেছে, এখনো চড়া রোদ্দুর চারদিকে। রোদটা একটু পড়লেই সে রওনা হবে।

এমন সময় গো-হাটার দিকে তার নজর পড়লো। এক জায়গায় বিস্তর লোক জড়ো হয়েছে, খুব হৈ-হৈ হচ্ছে সেখানে। একটা ঝোল্লা গোঁফওলা লোক হাত-পা নেড়ে কি সব যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে। দুটো দুষ্টু ছেলে পেছন থেকে তাকে বক দেখাচ্ছিলো—লোকটা কষে একটা তাড়া দিতেই তারা দৌড়ে পালিয়ে গেল।

দুর্যোধনের মনে হলো, ব্যাপারটা জানা দরকার। বোয়াল মাছ আর হাটের বোচকা চেনা আলুওলার দোকানে জিম্মা করে দিয়ে সে গুটি-গুটি পায়ে এগিয়ে গেল সেদিকে।

ব্যাপার আর কিছু নয়—ভিড়ের মাঝখানে সাদায়-কালোয় মেশানো এক পেল্লায় ষাঁড় দাঁড়িয়ে। মস্ত কুঁজ, মস্ত মস্ত শিং, গলার চামড়া ঝালরের মতো ঝুলে পড়েছে। তার চেহারা দেখেই আত্মারাম চমকে ওঠে। গলায় দড়ি বাঁধা, ঝোল্লা গোঁফওলা লোকটা ধরে

রয়েছে সেটা। আর ফোঁস-ফোঁস শব্দ করে ষাঁড়টা একটা বিরাট পচা বাঁধাকপি খেয়ে চলেছে।

কিন্তু আসল ব্যাপার ষাঁড়টা নয়। সেই গুঁফো লোকটাই রেল-গাড়ীর ক্যানভাসারের মতো সমানে একটানা গলায় বলে যাচ্ছিলো, চারদিকের মানুষগুলো তা-ই শুনছিলো কান পেতে।

—হাসি-মস্করার কথা নয় মশাই—এটি সোজা ষাঁড় নন। এনার আস্তানা ছেলো কাশীর বিশ্বনাথের গলিতে। ইনি হলেন সাক্ষাৎ মহাদেবের ষাঁড়ের বংশধর। শিং দু'খানার চেহারা একবার ছ্যাখেন?

—তা বিশ্বনাথের গলি ছেড়ে খালিশপুরের হাটে পচা কপি চিবুতে এলেন ক্যানে?—ভিড়ের ভেতর থেকে একজন জানতে চাইলো।

—লীলে—দেব্‌তার লীলে!—গুঁফো লোকটা একবার কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলো, ষাঁড়কে না বিশ্বনাথকে—কে জানে! তারপর আবার শুরু হলো বক্তৃতা: সে হলো গে অনেক কালের কথা। তখন যুদ্ধ চলছে। তখন ইনি ছেলেন নেহাৎ নাবালক—বিশ্বনাথের গলিতে ঘুরতেন। এর-তার দোকানে মুখ দিয়ে কারুর গজা, কারুর চমচম লোপাট করতেন। তা মিঠাই খেতি খেতি অরুচি ধরে গিয়েছেলো বলে একদিন এক বেনারসী শাড়ীর দোকানে মুখ বাড়িয়ে দু'খানা শাড়ী খেয়ে ফেলেছিলেন।

—দু'খানা বেনারসী শাড়ী খেলেন ইনি? সেই কচি বয়েসে?—একজন প্রায় খাবি খেলো: তা হলে এখন তো এক ডজন সতরঞ্চি খেয়ে ফেলতি পারেন!

—পারেন বই কি!—ঝোল্লাগুঁফো লোকটা মিটির-মিটির হেসে বললে, ইনি শিবের ষাঁড়ের বংশধর—এনার অসাধ্যি কি আছে! নিয়ে এসো না সতরঞ্চি, হাতে হাতে দেখিয়ে দিচ্ছি!

—বয়ে গেছে আমার! এখন আমি ষাঁড়ের জন্যি সতরঞ্চি কিনতি যাই আর কি!

পেছন থেকে সেই দুষ্টু ছেলেদুটো আবার বক দেখাচ্ছিলো। লোকটা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, অ্যাও! ত্যাখোন থেকে যে আমায় বক দেখাচ্ছিস, বলি ভেবেচিস কী! এক্ষুণি ষাঁড়ের মুখে ধরে দেবো, আধখানা চিবিয়ে দেবে—বুঝবি মজাটা।—বলেই সে ওদের ধরবার জন্যে হাত বাড়ালে।

—বাবা গো, গিচ্চি—গিছি—বলে ছেলে দুটো পাঁই-পাঁই করে ছুটে পালালো।

ভিড়ের মানুষগুলো অধৈর্য হয়ে উঠলো: কই, কাশী থেকে ইনি ক্যামন করে এলেন, তা তো বললে না।

—আহা, তাই তো বলছিনু—লোকটা একবার গোঁফে তা দিয়ে নিলে: তা তোমরা বলতি দিচ্চো কই? সেই যে বেনারসীওলা—সে ছেলো মহাফিচেল আর বেজায় ঘুঘু। রাতের বেলা ইনি এক মুদির দোকানের নীচে শুয়ে জাবর কাটছেন, কোথাও জন-মনিষ্যি নেই—ত্যাখোন বেনারসীওলা আর তার তিনটে ষণ্ডা ছেলে এসে এনাকে পিটতে পিটতে বড়ো রাস্তায় নিয়ে এলো। সেখানে গোরা মিলিটারীরা গাড়ী নিয়ে খাপ পেতে বসেছেলো—তারা তক্ষুণি এনাকে গাড়ীতে উঠিয়ে ফেললে। ওদের মতলব, এনাকে দিয়ে কালিয়া বানিয়ে খাবে!

—রাম-রাম—থু-থু—সবাই কানে আঙুল দিলে।

ষাঁড়টা পচা বাঁধাকপিটা শেষ করে এবার গলা খুলে আওয়াজ ছাড়লো: গুর্‌র্ ঝাঁই—গুর্‌র্ ঝাঁই—

—এই দ্যাখো—গুঁফো লোকটা মাথা নেড়ে বললে, সেই কথা শুনে ইনি এখনো কত কষ্ট পাচ্ছেন—তাই জানিয়ে দেলেন।

একজন বললে, বাপরে কী গলাখান! যেন মেঘ ডাকছে!

—তা, ইনি কালিয়া হতে গিয়ে বেঁচে এলেন কেমন করে?—বোকাসোকা চেহারার একটি রোগা লোক জানতে চাইলো।

—এনাকে রান্না করে খাবে এমন কেউ আছে নাকি দুনিয়ায় ? তা সে গোরা মিলিটারীই হোক আর যা-ই হোক। রেলগাড়ীতে চাপিয়ে এনাকে তো আসাম না কোথায় পাচার করছিলো। কী একটা ইস্‌টিশানে গাড়ী থেমেছে আর ইনি দড়ি ছিঁড়ে এক লাফে নেমে পড়েছেন। একজন মিলিটারী 'এ গরু ভাগো মৎ' বলে ধরতে এয়েছেলো, তাকে ঢুঁসিয়ে চিৎ করে ফেললেন। তারপর এক ছুটে মাঠের মধ্যি হাওয়া হয়ে গেলেন !

—তারপর ?

—তারপর আর কী ? ছিষ্টি চষে বেড়াতে লাগলেন। আজ এর খ্যাত সাবড়ে দ্যান, কাল ওর খামার আধাসাট করেন, পরশু হয়তো ধোপারা কোথাও কাপড় কাচতে দিয়েছে—ইনি এসে হাজির হলেন—'খেলে খেলে' বলতি না বলতি ডজনখানিক শাড়ী-জামা এনার পেটের গভ্‌ভরে চালান হয়ে গেল।

—তার চাইতে ইনি মিলিটারীর পেটের গভ্‌ভরে গেলিই তো ভালো হতো—একটা মন্তব্য ভেসে এলো।

—কে বললে, কে বললে একথা ?—গুঁফো লোকটা চটে উঠলো : মহাপাপী তো ! মরে নরকে যাবে—তারপর গো-ভূতেরা এসে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে তোমার ভুতুড়ি বের করে দেবে, দেখে নিয়ো।

কথাটা যে বলেছিলো, তার আর সাড়া পাওয়া গেল না।

—তা, তুমি এনাকে পেলে কী করে ?—আর একজনের জিজ্ঞাসা।

লোকটা আবার হাত তুলে মাথায় ঠেকালে : গুরুর দয়া।

—গরুর দয়া ?

—ধুত্তোর ! গুঁফো লোকটা আবার চটে গেল : গুরু আর গরুর তফাৎ বোঝো না—কোথাকার বুদ্ধু হে ?

—যেতি দাও, যেতি দাও—সেই বোকাসোকা মানুষটা আবার বললে, তুমি কী করে এনাকে পেলে, তাই বলো।

—তাই তো বলছি। একদিন রাত্তিরে স্বপন ছাখলাম, তোর দোরগোড়ায় শিবের ষাঁড়ের বংশধর রয়েছেন—বরণ করে নে—একজন সাধু যেন আমায় বলচেন। আমি বললাম, বাবা, তিনি আমার দোরে এলেন কী করে? ত্যাখন সাধু আমায় সব কথা খুলে বললেন। আমি বললুম, বাবা, এনাকে খাওয়াবো কী? সাধু বললেন, যা দিবি, তাই খাবেন—তারপর নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নেবেন। তুই শুধু এনাকে গোয়ালে থাকতে দিস। দেখিস, তোর ভালো হবে। ঘুম ভেঙে দেখি, ইনি দোর জুড়ে শুয়ে রয়েচেন—য্যানো গন্ধমাদন! বললুম, বাবা—দরজা ছেড়ে ছাও—নইলে তো বেরুতি পারবো না। তার চে' গোয়ালে চলে এসো। তক্ষুণি ঝাঁ-গুর্-গুর্ বলে জয়ঢাকের মতো আওয়াজ ছেড়ে দাঁড়ালেন, আর সুড়সুড়িয়ে গোয়ালে এলেন।

—তারপর?

—তারপর যা হলো, কী বলবো! একটা হাঁস ছু বচ্ছর ডিম দিচ্ছিলো না, একরাতে সেটা ছ'টা ডিম পেড়ে ফেললে—

—দূর্!—একজন প্রতিবাদ করলো: বাজে কথা বললিই শুনবো? একরাত্রে হাঁসে ছ'টা ডিম পাড়তি পারে কখনো?

—পারে। গুরুর দয়া হলিই—

—গুরুর দয়া নয়, গরুর দয়া বলো মোড়ল।

—আচ্ছা আচ্ছা গরুর দয়া না হয় হলো। কিন্তু হাঁসে ছ'টা ডিম পাড়লো, একটা মরা আমগাছ ভরে বউল এলো, আমার খুড়ো কোমরের বাতে এক বচ্ছর বিছ্নায় পড়েছেলো—তিনি তিড়িং করে উঠে মাঠে দৌড়ে গেল যে! বললে পেত্যয় যাবে না—তক্ষুণি জমিতে চাষ দিয়ে এলো! একটা ভোঁদড় রোজ পুকুরের মাছ খেয়ে যাচ্ছিলো, একদিন একটা চেতল মাছ তার ঠ্যাঙে অ্যায়সা কামড়ে দিলে যে সেটা খোঁড়া হয়ে চিল্লোতে চিল্লোতে দেশ ছেড়ে পালালে!

—একেই বলে গরুর দয়া!—এতক্ষণে কথা বললে দুর্যোধন।

—তবেই বুঝে ন্যাও। এ ষাঁড় যার ঘরে যাবে—তার লক্ষ্মী একেবারে বাঁধা। কিনে ফেলো—কিনে ফেলো।—গুঁফো লোকটা বেশ জোরে জোরে হাঁক ছাড়লো।

—বিলিয়ে গ্যাও না ক্যানে ? পড়ে-পাওয়া ষাঁড় বেচতে এয়েচো ? ঘরের লক্ষ্মীই বা বিদেয় করছো কেনে ?—দুর্যোধন জানতে চাইলো।

—স্বপ্নাদেশ গেলাম যে! একদিন আবার সেই সাধু এসে বললেন, রাখোহরি হাজরা—কাজটা তো ভালো হচ্চেনি, বাছা! ইনি এয়েছেন সক্কলের ভালো করবার জন্যি—তুই একাই এনাকে দখল করে রাখবি ? এবার ছেড়ে দে। তাই হাটে বেচতে এনু।

—বেচবে ক্যানে ? এমনিই দিয়ে গ্যাও—দুর্যোধন বললে।

—বাঃ, শিবপূজো দিতি হবে না ? পঞ্চাশ টাকা খরচ করতি হবে—সাধু বলে দিয়েচেন।

—পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ষাঁড়! বলি পাগল না পেট-খারাপ ?

—একটু লোক্সান করেও দিতি পারি—দেবতার জিনিস। চল্লিশ টাকা হলিও নিতি পারো!

—বোকা ভুলোবার জায়গা পাওনি আর ?—এইবারে একজনের প্রতিবাদ শোনা গেল : গাঁজাখুরী গপ্পো শুনিয়ে টাকা নেবে ? পয়সা দিয়ে কেউ ষাঁড় কেনে ?

রাখোহরি হাজরা চটে গেল : তুমি তো ভারী পাপী লোক হে। মরে নরকে যাবে আর গো-ভূতে—

—ধ্যাত্তোর গো-ভূত।—সে লোকটা সবাইকে ডেকে বললে, চলো হে চলো। ওসব বিশ্বাস করতি নেই।

রাখোহরি দাঁত খিঁচিয়ে বললে, এতক্ষণ দিব্যি কানখাড়া করে শুনছিলে ; আর পয়সার বেলাতেই অমনি বিশ্বাস করতি নেই! যাও—যাও! অনেক পুণ্যি থাকলে শিবের ষাঁড় কিন্তি পায়—তোমার বরাতে থাকলি তো!

দলবল নিয়ে অবিশ্বাসীটা চলে গেল, কিছু লোক দাঁড়িয়ে রইলো তখনো। আর রাখোহরি সমানে গলা চড়িয়ে বলতে লাগলো : নিয়ে যাও--নিয়ে যাও—শিবের ষাঁড়। ঘরে থাকলেই লক্ষ্মী ঠাকরুণ বাঁধা। খাবার-দাবারের ভাবনা নেই—কলা-মূলো, ছেঁড়া কাপড় যা দেবে তাই খাবেন। শুধু গোয়ালে বেঁধে রাখলেই গরুতে কেঁড়ে ভর্তি দুধ দেবে, ক্ষেত ভরে ফসল হবে, খুড়োর বাত সেরে যাবে, একটা হাঁসে ছ'টা করে ডিম পাড়বে—

দুর্যোধন ফিরে যাচ্ছিলো, হঠাৎ কানে এলো : শুধু একটি জিনিস সাবধান। সেটি দেখলেই ওনার মেজাজ বিগড়ে যায়। সেটি হলো—

আর সেটি যে কী, তাই শুনেই দুর্যোধন ঘুরে এলো ষাঁড়ওলার কাছে। একসঙ্গে তার অনেকগুলো কথা মনে পড়ে গেল।

—পাঁচ সিকে দিতে পারি, ষাঁড় দেবে ?

—পাঁচসিকে। তা কী করে হয় ?—রাখোহরি বললে, অন্তত পাঁচ টাকা হলেও—

—না, পাঁচ সিকের এক পয়সাও বেশি নয়।

—আচ্ছা ন্যাও তবে।—ব্যাজার হয়ে রাখোহরি বললে, বিনি পয়সাতেই লক্ষ্মী ছেড়ে দিলাম। তোমার বরাত ভালো, মোড়ল—নির্ঘাৎ শেয়াল বাঁয়ে রেখে হেঁটে এসেছিলে!

পাঁচসিকে দিয়ে ষাঁড় কিনে, দড়ি ধরে দুর্যোধন রওনা হল বাড়ীর দিকে। দড়ি টানতে হলো না, ষাঁড় আপনিই সুড়-সুড় করে চলতে লাগলো তার সঙ্গে। হাটের লোক তার বোকামো দেখে নানা রকম ঠাট্টা করতে লাগলো, কোত্থেকে সেই ত্যাঁদোড় ছেলে এসে পেছন থেকে বক দেখাতে লাগলো। কিন্তু দুর্যোধন ভ্রূক্ষেপও করলো না—গম্ভীরভাবে এগিয়ে চললো।

পথে শিবের ষাঁড় বিশেষ গোলমাল করলো না। শুধু একফাঁকে দুর্যোধনের কাঁধ থেকে নতুন নীল গামছাটা নিয়ে খেয়ে ফেললো, তার

হাটের বোঁচকা থেকে একটা লাউয়ের বোঁটা বেরিয়েছিলো—সেটা টেনে অনেকক্ষণ ধরে চিবুলো, একজন হাটুরে এক বোঝা শাক নিয়ে যাচ্ছিলো—ঝাঁ করে তার অর্ধেকটাই মুখে তুলে নিলে! সে গালাগাল করতে লাগলো, দুর্যোধন ফিরেও চাইলো না।

তারপর দুর্যোধন খেয়াঘাটে পৌঁছুলো। নৌকোয় উঠলো না—ষাঁড়ের ঘাড়ে চেপে নদীতে নামলো। ষাঁড় এক-আধবার আপত্তি করলো, ঝেড়ে ফেলতে চাইলো, কিন্তু দুর্যোধন শক্ত করে কুঁজটা পাকড়ে আছে—বিশেষ সুবিধে করতে পারলো না। শুধু দু-একবার চটাং-চটাং করে ল্যাজের ঘা লাগালো, চাবুকের ঘায়ের মতোই লাগলো সেটা। দুর্যোধন মুখ-নাক সিঁটকে বসে রইলো।

আর, তাই দেখে---ঘাট-মাঝির চালার ভেতরে বসে, মুচকে মুচকে হাসলো গোবরা গড়াই : বটে—বটে। এবারেও ঘাটের পয়সা না দিয়ে পালাবার মতলব। দাঁড়াও-দাঁড়াও—

এবারে উঠে রাস্তার দিকে পা বাড়াতেই, সেই টকটকে লাল পাগড়ী মাথায় চড়িয়ে—আদালতের পেয়াদার মতো মেজাজ নিয়ে গোবরা তেড়ে এলো : বলি, পয়সা না দিয়ে—

আর বলতে হলো না। 'গর্‌র্‌—গুর্‌র্‌—ঝা—ঝাং'—বলে এক গগনভেদী হাঁক ছাড়লো বিশ্বনাথের ষাঁড়। তারপর সামনের পা দিয়ে দু'বার বালি খুঁড়েই—মাথা নামিয়ে সেই মস্ত মস্ত শিং বাগিয়ে গোবরাকে তাড়া করলো।

—বাবা গো গিছি—মেলে-মেলে (মারলে—মারলে)—বলতে বলতে গোবরা প্রাণপণে ছুটলো, ষাঁড়ও ছুটলো পেছনে-পেছনে। সে কি দৌড়! যেন একখানা গাড়ী নিয়েই পাঞ্জাব মেল ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে ছুটে চললো। চোখের পলকে মাঠ-ঘাট-বন-বাদাড় পেরিয়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেল তারা। পাঞ্জাব মেলের সঙ্গে কেবল তফাৎ এই যে, এর এঞ্জিনটা পেছন দিকে!

দুর্যোধন মনে মনে বললে, ছোটো গোবর্ধন—ছোটো! শিবের ষাঁড়—দৌড় করাতে করাতে তোমায় কৈলেসে নিয়ে যাবে। ঘাটের পয়সা আর নিতে হচ্ছেনি!

হাঁ, খেয়াঘাটের চার পয়সা বাঁচানোর জন্যেই পাঁচ সিকেতে ষাঁড় কিনেছে দুর্যোধন, দেড় টাকার গামছা আর ছ'আনার লাউটাও গেছে। কারণ, রাখোহরি বলেছিলো, 'এনার সব ভালো—কেবল টকটকে নাল (লাল) কাপড় দেখলিই ক্ষেপে যান।' আর তাই শুনেই গোবরার লাল পাগড়ীটার কথা দুর্যোধনের মনে পড়ে গিয়েছিলো।

গোবরা এবং ষাঁড় এতক্ষণে কত দূরে কে জানে। হয়তো কৈলাসের কাছাকাছিই গিয়ে পৌঁচেছে! খরচ একটু বেশিই হলো, কিন্তু প্রতিশোধের দামটাই কি কম!

একটা বিড়ি ধরিয়ে, গুন-গুনিয়ে গান গাইতে গাইতে বাড়ী চললো দুর্যোধন।

তালিয়াৎ

বর্ধমান থেকে ফিরে আসছিলুম। আমি আর হাবুল সেন।

একে কনকনে শীতের রাত, তায় শেষ ট্রেন। ছোট কামরাটায় যাত্রী নেই বললেই চলে। শুধু লাঠি হাতে মোটাসোটা এক ভদ্রলোক উঠেছিলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্কে চেপে কম্বল মুড়ি দিয়েছেন।

শক্তিগড় ষ্টেশনে আর এক ভদ্রলোক উঠলেন। রোগা লম্বা চেহারা—গায়ে বেমানান ধুমসো ওভারকোট। কান-মাথা একটা খাকী রঙের মাফলারে জড়ানো। মুখে সরু গোঁফের রেখা—চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা।

আমি আর হাবুল তখন বর্ধমানের গল্প করছিলুম। মানে দু'জনে বেড়াতে গিয়েছিলুম হাবুলের মাসীমার বাড়ীতে। খাওয়াদাওয়া হয়েছিলো ভালো, মেসো আর মাসীমাও খাসা লোক, কিন্তু মেসোমশাইয়ের এক বন্ধু এসে সব মাটি করে দিলেন। তিনি নাকি খুব বড়ো গাইয়ে। কোত্থেকে একটা হারমোনিয়াম নিয়ে এসে 'তেলে না তেলে না তেলে না না দে'—গাইতে লাগলেন। মেসোমশাই ভীষণ খুশি—মাসীমাও ঘন ঘন মাথা নাড়ছিলেন, কিন্তু আমরা দু'জনে গরম তেলে পড়ে কইমাছের মতো ছটফট করতে লাগলুম।

হাবুল ঢাকাই ভাষায় বললে, তোরে সত্য কই প্যালা—গান শুইন্যা আমার মাথাটা বন্‌বনাইয়া ঘুরতে আছিলো।

আমি বললুম, যা বলেছিস, গান তো নয়—যেন মেশিন-গান।

—হঃ, কান ফুটা কইরা দিতাছে একেবারে। আরে বাপু, এত ভালো ভালো রবীন্দ্র-সংগীত থাকতে ক্লাসিকাল গান গাওনের দরকারডা কী! কিছু বোঝন যায় না—ক্যাবল চিৎকার!

ওভারকোট-পরা ভদ্রলোক একটা বিড়ি ধরিয়ে মিটি মিটি হাসছিলেন। এবার বেশ শব্দ করে গলা খাঁকারি দিলেন। আমরা চমকে তাঁর দিকে তাকালাম।

বললেন, ক্লাসিকেল গান বুঝি তোমাদের ভালো লাগে না?

আমি বললুম, আজ্ঞে ভালো লাগবে কী করে? কিছু তো বোঝা যায় না।

ওভারকোট বিড়িটায় একটা মস্ত টান দিয়ে বললেন, আসল কথা কী জানো, তাল বোঝা চাই। তাল বুঝলেই গান বোঝা যায়।

হাবুল সেন বললে, তাল বুঝুম না ক্যান? তালের বড়া তো খাইতে খুবই ভালো লাগে।

—আহা-হা, সে তাল নয়। গানের তাল।

—অ।

বেশ কায়দা করে বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে ভদ্রলোক বললেন, তালই হচ্ছে গানের প্রাণ। তাল বুঝলেই ক্লাসিকেল গান তালের পাটালীর মতো মধুর লাগবে।

—তালক্ষীরের মতো উপাদেয় মনে হবে—আমি জুড়ে দিলুম।

—ঠিক।—ভদ্রলোক খুশি হলেন: তোমার বেশ বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে দেখছি। তালই হলো গানের রস—মানে তালবড়া, তালপাটালী আর তালক্ষীরের কম্বিনেশন।

হাবুল ভেবে-চিন্তে জিগ্যেস করলে, কিন্তু সুর?

আমি বললুম, ওটা গানের শুঁড়। মানে, লোকের কান পাকড়ে আনে। শিব্রাম চক্রবর্তী লিখেছেন।—তারপর বেশ গর্ব করে বললুম, জানেন, শিব্রাম দা'র সঙ্গে আমার আলাপ আছে।

ওভারকোট হাসলেন: তোমার শিব্রাম দা তো বাচ্চাদের জন্যে হাসির গল্প লেখেন, শুনেছি। কিন্তু গানের তিনি কী জানেন? আমি একটা উপমা দিয়ে বোঝাই। ভোজপুরী লাঠি দেখেছো কখনো?

আমি বললুম, বিস্তর। হাজীপুরে মেজদা থাকে—সেখানে আমি অনেকবার গেছি। গাঁটে গাঁটে বাঁধানো তেল চুকচকে সব লাঠি—এক ঘা পিঠে পড়লেই আর দেখতে হবে না।

ওভারকোট হাঁটুতে থাবড়া দিলেন: ইয়া! একদম কারেক্ট! গাছকে যদি লাঠি বলে ধরা যায়—তা হলে তাল হলো তার গাঁট। ওই গাঁট না থাকলে লাঠির কোনো মানে হয় না।

হাবুল সেন মাথা নেড়ে বললে, গানেরও না। তালের গাঁট ডুমাদ্দুম পিঠে পড়তে থাকে।

ওভারকোট আবার হাসলেন: যে তাল বোঝে, তার কাছে ওই গাঁটই আখের গাঁট হয়। একবার চিবুতে শেখো, তারপরেই মন মজে যাবে। আচ্ছা—এখুনি তোমাদের একটু তালিয়ে দিই?

—এখুনি?—প্রস্তাবটা আমার ভালো লাগলো না।

—মন্দ কী?—ওভারকোট অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলেন: কলকাতায় পৌঁছুতে এখনো তো অনেকটা সময় লাগবে। দারুণ শীত পড়েছে, তাল শিখলে শরীরটাও একটু গরম হবে। আচ্ছা—এই ছাখো—হাবুলের ছোট চামড়ার সুটকেসটা নিয়ে টকাটক বাজাতে লাগলেন, এই যে দেখছো—এই 'ধা-ধিনা-ধিনা'—এই হচ্ছে দাদরা!

—অ!

—আর এই 'ধিনি কেটে ধা'—এ হচ্ছে কার্ফা। বুঝেছো? একটু কান পেতে শোনো খুব মিঠে লাগবে।

আমি বললুম, আজ্ঞে খুব মিঠে লাগছে না তো।

—আহা, বাঁয়া-তবলা না থাকলে কখনো বোল্ ওঠে? চামড়ার সুটকেস কিনা—তাই কেবল ঢপঢপ করছে।

—আমি বললুম, তা ছাড়া কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

হাবুল বললে, আহা, এইডা বোঝসনা ক্যান? তাল তো গোলই হইবো। চৌকা তাল কোনোদিন ছাখ্ছস্ নাকি?

ভদ্রলোক নাক দিয়ে কেমন ঘোড়ার মতো আওয়াজ বের করে ই-হিঁ-হিঁ শব্দে কিছুক্ষণ হাসলেন। বললেন, ছেলেমানুষ! তালের নামে তালগোল একটু হবেই। আর চৌকো তালের কথাই যদি বললে, তা থেকে আমার চৌতাল মনে পড়লো। খুব শক্ত জিনিস—ভদ্রলোক টকাটক করে আবার খানিকটা সুটকেস বাজালেন, একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, কী করে যে বোঝাই! আচ্ছা—ট্রেনের আওয়াজ পাচ্ছো?

—পাচ্ছি বই কি।

—কি রকম শোনাচ্ছে?

হাবুল বললে, যেন কইতে আছে: চাইল্‌তা তলায় বইসা যা—পাকা-পাকা খাজুর খা!

ভদ্রলোক বললেন, কী? চাল্‌তে তলায় বসে যা—পাকা পাকা খেজুর খা? বাঃ—মন্দ বলোনি তো। হ্যাঁ, চৌতাল অনেকটা এই রকমই। এই 'ধিনি-গিধা—ধিনি-গিধা—'

আবার টকাটক তাল পড়তে লাগলো সুটকেসে: এই চাল্‌তে তলায় ধা—! পাকা খেজুর খা! ধিনি গিধা—ধা! এবার ঠিক বুঝতে পারছো তো?

হাবুল বললে, আইজ্ঞা না। তবে আপনার আগের দুইটা তাল বেশ বুঝতে আছিলাম। কার পা? না দাদার পা। আইচ্ছা মশায়, এত জিনিস থাকতে দাদার পা নিয়া টানাটানি ক্যান্?

ওভারকোট একটু বিরক্ত হলেন: আঃ—তুমি তো বড্ড বেরসিক দেখছি! ও দুটো কার পা—দাদার পা নয়। কার্ফা আর দাদ্‌রা।

—অ-অ।

—শোনো, চৌতাল বোঝার আগে ত্রিতালটা একবার জানা দরকার।—ওভারকোট আর একটা বিড়ি ধরালেন, কয়েকটা টান দিয়ে সেটাকে নিবিয়ে পকেটে পুরে বলতে লাগলেন: একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি।

এই ধরো, এই গানটা—বলে গুনগুন করে গাইতে লাগলেন তিনি :

পঞ্চু পিসে ছাতের পরে
ভূতের সাথে কুস্তি লড়ে !
রাত ঝম্‌ঝম্ অন্ধকার—
হুতোম প্যাঁচা আম্পায়ার।
পঞ্চু পিসে মারলো ল্যাং
মট্‌কে গেল ভূতের ঠ্যাং !
ভূতটা তখন বললে কাঁদি—
'গোবর আনো—পট্টি বাঁধি !'

এই যে করুণ পদটা—মানে, মটকে গেল ভূতের ঠ্যাং—এটাকে খাসা ত্রিতালে ফেলা যায়।—বলেই টকাটক সুটকেসে বাজাতে লাগলেন—না ধিনা ধিনা ধা—না ধিনা—মানে, এই তালটা—

ঠিক সেই সময় আচমকা গাড়ীর ভেতরেও তাল পড়লো। মনে হলো একটা নয়, এক কাঁদি এসে পড়লো !

বাঙ্কে যিনি ঘুমুচ্ছিলেন সেই মোটা ভদ্রলোক এক লাফে নেমে পড়েছেন। ইয়া তাগড়াই চেহারা, লাল টক্‌টকে বড়ো বড়ো চোখ রাগে দপ-দপ করে জ্বলছে।

ওভারকোটের তাল বাজানো বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, মোটা ভদ্রলোক বাজখাঁই গলায় ওভারকোটকে বললেন—বলি, কী হচ্ছে এসব ? এর মানে কী ? অনেকক্ষণ দাঁতে দাঁত চেপে সয়েছিলুম··· সব কিছুর একটা সীমা আছে !

ওভারকোট কেমন শিঁটিয়ে গেলেন। চিঁ চিঁ করে বললেন—এদের একটু তাল শেখাচ্ছিলুম।

—তাল ! ওর নাম তাল ? আমি পুরুলিয়ার অরবিন্দ মাহাতো, মরিস্ কলেজে গান শিখেছি, কাশীর কণ্ঠে মহারাজার ছাত্র—আমার সামনে তাল নিয়ে এয়ার্কি ? এদের ছেলেমানুষ পেয়ে ওস্তাদি ?

ধিনি কেটে ধা—কার্ফা ? পাকা খেজুর খা—চৌতাল ?

—আজ্ঞে—

—শাট্ আপ !—মোটা ভদ্রলোক সিংহনাদ করলেন : তালের বিন্দু-বিসর্গ জানেন আপনি ? সাত বছর গুরুজীর পায়ের কাছে বসে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাল শিখেছি—আর তাই নিয়ে নষ্টামো ? মট্‌কে গেলো ভূতের ঠ্যাং—ত্রিতাল ? আর তাল হলো লাঠির গাঁট ? তবে লাঠির গাঁটই দেখুন···

বলেই মোটা লাঠিটা তুলে নিলেন বাক্স থেকে।

—এইবার এই লাঠির এক এক ঘায়ে এক একটা তাল বোঝাচ্ছি, আপনাকে। দেখি, কোন্ তালে আপনি আছেন। প্রথমেই দাদ্‌রা—

লাঠি তুললেন, কিন্তু দাদরা বাজানোর আর সময় পেলেন না ! ওভারকোট তার মধ্যেই সুড়ুৎ করে চলে গিয়েছেন দরজার কাছে। ট্রেন তখন একটা স্টেশনে থামতে যাচ্ছিলো, এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্লাট্‌ফর্মে !

আমরা এতক্ষণে থ হয়ে যেন ম্যাজিক দেখছিলুম ! এইবার হাবুল চেঁচিয়ে উঠলো।—বুঝছি, বুঝছি—এইটার নাম ঝাঁপতাল !

ঢ্যাংচাদার 'হাহাকার'

ক্যাবলা বললে—বড়দার বন্ধু গোবরবাবু ফিলিমে একটা পার্ট পেয়েছে।

টেনিদা চার পয়সার চীনেবাদাম শেষ করে এখন তার খোলা-গুলোর ভেতর খোঁজাখুঁজি করছিলো। আশা ছিল, দু-একটা শাঁস এখনো লুকিয়ে থাকতে পারে। যখন কিচ্ছু পেলে না, তখন খুব বিরক্ত হয়ে একটা খোলাই তুলে নিলে, কড়মড় করে চিবুতে চিবুতে বললে, বারণ কর ক্যাবলা—এক্ষুনি বারণ করে দে!

ক্যাবলা আশ্চর্য হয়ে বললে, কাকে বারণ করবো? গোবরবাবুকে?

—আলবাৎ। নইলে তোর গোবরবাবু স্রেফ ঘুঁটে হয়ে যাবে!

—ঘুঁটে হবে কেন? সেই যে কী বলে—মানে স্টার হবে।··· আমি বলতে চেষ্টা করলুম।

—স্টার হবে? আমার ঢ্যাংচাদাও স্টার হতে গিয়েছিলো, বুঝলি? এখন নেংচে নেংচে হাঁটে আর সিনেমা হাউসের পাশ দিয়ে যাবার সময় কানে আঙুল দিয়ে, চোখ বুজে, খুব মিহি সুরে 'দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু কৃপাবিন্দু বিতরো'—এই গানটা গাইতে গাইতে পেরিয়ে যায়।

—বুঝতে পারছি।···হাবুল সেন মাথা নাড়লো: তোমার ঢ্যাংচাদা-রে ফিলিমের লোকেরা মাইরা ল্যাংড়া কইরা দিছে।

—হুঃ, মাইর‍্যা ল্যাংড়া করছে!—টেনিদা ভেংচে বললে, খামোকা বক্‌বক্ করিস নি, হাবুল! যেন এক নম্বরের কুরুবক!

ক্যাবলা বললে—কুরুবক তো ভালোই। এক রকমের ফুল।

—থাম, তুই আর সবজান্তাগিরি করিসনি। কুরুবক যদি ফুল হয়, তা হলে কানি-বকও একরকমের গোলাপফুল! তা হলে পাতি

হাঁসও এক রকমের ফজলী আম ! তাহলে কাকগুলোও একরকমের বনলতা হতে পারে !

ক্যাবলা বললে—বা-রে, তুমি ডিক্‌শনারী খুলে ছাখো না !

—শাট্‌ আপ ! ডিক্‌শনারী। আমিই আমার ডিক্‌শনারী। আমি বলছি কুরুবক এক ধরনের বক—খুব খারাপ, খুব বিচ্ছিরী বক। যদি চালিয়াতি করবি তো এক চাঁটিতে তোর দাঁত—

—দাঁতনে পাঠিয়ে দেবো।—আমি জুড়ে দিলুম : কিন্তু বকের বকবকানি এখন বন্ধ করো না বাপু। কী হ্যাংচাদার গল্প যেন বলছিলে ?

—অঃ, ফাঁকি দিয়ে গপ্প শোনার ফন্দি ? টেনি শর্মাকে অমন 'আন্‌রাইপ চাইল্ড' মানে কাঁচা ছেলে পাওনি—বুঝেছো, প্যালারাম চন্দর ? হ্যাংচাদার রোমহর্ষক কাহিনী যদি শুনতে চাও তা হলে এক্ষুনি পকেট থেকে ঝাল-নুনের শিশিটি বের করো। একটু আগেই লুকিয়ে লুকিয়ে চাটা হচ্ছিলো, আমি বুঝি দেখতে পাইনি ?

কী ডেঞ্জারাস চোখ—দেখেছো ? কত হুঁশিয়ার হয়ে থাচ্ছি—ঠিক দেখে ফেলেছে ! সাধে কি ইস্কুলের পণ্ডিতমশাই টেনিদাকে বলতেন, বাবা ভজহরি—তুমি হচ্ছো পয়লা নম্বরের 'শিরিগাল'···মানে ফক্‌স্‌ !

দেখেছে যখন, কেড়েই নেবে। কী আর করি—মানে মানে দিতেই হলো শিশিটা।

প্রায় অর্ধেকটা ঝাল-নুন একবারে চেটে নিয়ে টেনিদা বললে—হ্যাংচাদা—মানে আমার বাগবাজারের মাসতুতো ভাই—

হাবুল বললে—চোরে চোরে।

—অ্যাঁ ! কী বললি ?

—না—না, আমি কিছু কই নাই। কইতাছিলাম, একটু জোরে জোরে কও !

—জোরে ?—টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে নাকটাকে আলুসেদ্ধর মতো করে বললে, আমাকে কি অল্ ইণ্ডিয়া রেডিয়ো পেলি যে, খামোকা হাউমাউ করে চ্যাঁচাবো ? মিথ্যে বাধা দিবি তো এক গাঁট্টায় চাঁদি—

আমি বললুম—চাঁদপুরে পাঠিয়ে দেবো !

—যা বলেছিস !—বলেই টেনিদা আমার মাথায় টকাস্ করে গাঁট্টা মারতে যাচ্ছিলো, আমি চট্ করে সরে গিয়ে মাথা বাঁচালুম ।

আমাকে গাঁট্টা মারতে না পেরে ব্যাজার হয়ে টেনিদা বললে—'দরকারের সময় হাতের কাছে কিচ্ছু পাওয়া যায় না—বোগাস্ ! মরুক গে—হ্যাংচাদার কথাই বলি । খবরদার কথার মাঝখানে ডিসটার্ব করবি না কেউ ।

হ্যাঁ, যা বলছি । আমার বাগবাজারের মাসতুতো ভাই হ্যাংচাদার ছিলো ভীষণ ফিলিমে নামবার শখ ! বায়োস্কোপ দেখে দেখে রাত-দিন ওর ভাব লেগেই থাকতো । বললে বিশ্বাস করবি নে, বাজারে কাঁচকলা কিনতে গেছে—হঠাৎ ওর ভাব এসে গেল । বললে, ওগো তরুণ কদলী ! এই নিষ্ঠুর সংসার তোমাকে ঝোলের মধ্যে রান্না করে খায়—তোমার অরুণ হিয়ার করুণ ব্যথা কে বুঝবে ! এই বলে, খুব কায়দা করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে 'ওফ্' বলতে যাচ্ছে, এমন সময় কাঁচকলাওয়ালা বললে, কোথাকার এঁচোড়ে পাকা ছেলে রে । দিতে হয় কান ধরে এক থাপ্পড় । হ্যাংচাদা আমার কানে কানে বললে—অহো—কী নৃশংস মনুষ্য—দেখেছিস্ ?

এমন ভাবের মাথায় কেউ কি আই-এ পাস করতে পারে ? হ্যাংচাদা সব সাব্জেক্টে ফেল করে গেল । আর মেসোমশাই অফিস থেকে ফিরে এসে যা যা বললেন, সে আর তোদের শুনে কাজ নেই । যোদ্দা, অপমানে হ্যাংচাদার সারারাত কান কটকট করতে লাগলো । প্রতিজ্ঞা করলো, হয় ফিলিমে নেমে প্রতিভায় চারিদিক অন্ধকার করে দেবে—নইলে এ পোড়া কান আর রাখবে না ।

খুব ইচ্ছেশক্তি থাকলে, মানে—মনে খুব তেজ এসে গেলে—বুঝলি অঘটন একটা ঘটেই যায়। ক্যাংচাদা তো মনের দুঃখে সকালবেলা 'দি গ্র্যাণ্ড্ আবার খাবো রেস্তোরাঁয় ঢুকে এক পেয়ালা চা আর ডবল ডিমের মামলেট নিয়ে বসেছে। এমন সময় খুব স্যুট-টাই হাঁকড়ে এক ছোক্‌রা এসে বসলো ক্যাংচাদার টেবিলে। ক্যাংচাদা দেখলে, তার কাছে একটা নীল রঙের ফাইল···আর তার ওপরে খুব বড়ো বড়ো করে লেখা 'ইউরেকা ফিলিম কোং'। নবতম অবদান—'হাহাকার'।

ক্যাংচাদার মনের অবস্থা তো বুঝতেই পারছিস। উত্তেজনায় তার কানের ভেতর যেন তিনটে করে উচ্চিংড়ে লাফাতে লাগলো, নাকের মধ্যে যেন আরশোলারা সুড়সুড়ি দিতে লাগলো। তার সামনেই জলজ্যান্ত ফিলিমের লোক বসে—তাতে আবার নবতম অবদান। একেই বলে মেঘ না চাইতে জল। কে বলে, কলিযুগে ভগবান নেই!

ক্যাংচাদা বাগবাজারের ছেলে—তুখোড় চীজ! তিন মিনিটে আলাপ জমিয়ে নিলে। লোকটার নাম চন্দ্রবদন চম্পটী—সে হলো 'হাহাকার' ফিলিমের একজন অ্যাসিস্‌ট্যান্ট্। মানে, ছবির ডিরেক্‌টারকে সাহায্য করে আর কি!

হাবুল বললে—সহকারী পরিচালক।

—চোপরাও!—টেনিদা হাবুলকে এক বাঘা ধমক লাগিয়ে বলে চললো, চন্দ্রবদনকে ক্যাংচাদা ভজিয়ে ফেললে। তার বদনে দুটো ডবল ডিমের মামলেট্, চারটে টোস্ট্ আর তিন কাপ চা ঘুষ দিয়ে—শেষে হাতে চাঁদ পেয়ে গেল ক্যাংচাদা। ওঠবার সময় চন্দ্রবদন বললে—এত করে বলছেন যখন—বেশ, আপনাকে আমি ফিলিমে চান্স দেবো। কাল বেলা দশটার সময় যাবেন বরানগরের ইউরেকা ফিলিমে—নামিয়ে দেবো জনতার দৃশ্যে।

হাত কচলাতে কচলাতে ক্যাংচাদা বললে, স্টুডিয়োটা কোথায়, স্যর?

চন্দ্রবদন জায়গাটা বাৎলে দিলে। বললে—দেখলেই চিনতে পারবেন। উঁচু পাঁচিল—বাইরে লেখা রয়েছে ইউরেকা ফিলিম কোং। আচ্ছা আসি এখন, ভেরি বিজি, টা—টা—

হাত নেড়ে চন্দ্রবদন তড়াক করে একটা চলতি বাসে উঠলো।

সেদিন রাত্তিরে তো হ্যাংচাদার আর ঘুম হয় না। বার বার বিছানা থেকে উঠে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জনতার দৃশ্যে পার্ট করছে। মানে, কখনো স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে—কখনো জয়ধ্বনি করছে, কখনো অট্টহাসি হাসছে। অবিশ্যি হাসি আর জয়ধ্বনিটা নিঃশব্দেই হচ্ছে—পাশের ঘরেই আবার মেসোমশাই ঘুমোন কিনা!

সারা রাত ধরে জনতার দৃশ্য সড়গড় করে নিয়ে হ্যাংচাদা সকাল ন'টার আগেই সোজা ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাসে চেপে বসলো। তারপর জায়গাটা আঁচ করে নেমে পড়লো বাস থেকে।

খানিকটা হাঁটতেই—আরে, ওই তো উঁচু পাঁচিল। ওইটেই নিশ্চয় ইউরেকা ফিলিম।

গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেল হ্যাংচাদা। বাইরে একটা মস্ত লোহার গেট—ভেতর থেকে বন্ধ। তার ওপরে বোর্ডে কী একটা নাম লেখা আছে—কিন্তু লতার ঝাড়ে নামটা পড়া যাচ্ছে না—দেখা যাচ্ছে কেবল তিনটে হরফ—এল্, ইউ, এম।

এল-ইউ-এম! লাম! মানে ফিলাম। তার মানেই ফিলিম।

ক্যাবলা আপত্তি করলে, লাম! লাম কেন হবে? এফ-আই-এল্-এম্—ফিল্ম্!

টেনিদা রেগেমেগে চিৎকার করে উঠলো: সায়লেন্স্! আবার কুরুবকের মতো বক্ বক্ করছিস? এই রইলো গল্প—আমি চললুম।

প্রায় চলেই যাচ্ছিলো, আমরা টেনেটুনে টেনিদাকে বসালুম। হাবুল বললে, ছাইড়্যা গ্ভাও ক্যাব্লার কথা—চ্যাংড়া!

—চ্যাংড়া! ফের ডিস্টার্ব করলে ট্যাংরা মাছ বানিয়ে দেবো বলে

রাখছি। হুঁ:! লোহার গেট বন্ধ দেখে হ্যাংচাদা গোড়াতে তো খুব ঘাবড়ে গেল। ভাবলে, চন্দ্রবদন নির্ঘাত গুলপট্টি দিয়ে দিব্যি পরস্মৈপদী খেয়েদেয়ে সটকান দিয়েছে। তারপর ভাবলে, অন্যদিকেও তো দরজা থাকতে পারে। দেখা যাক।

পাঁচিলের পাশ দিয়ে ঘুর ঘুর করছে—গেট-ফেট তো দেখা যাচ্ছে না। খুব দমে গেছে, এমন সময় হঠাৎ ভীষণ মোটা গলায় কে বললে, হু আর ইউ ?

হ্যাংচাদা তাকিয়ে দেখলো, পাঁচিলের ভেতর একটা ছোট ফুটো। তার মধ্যে কার দুটো জ্বলজ্বলে চোখ আর একজোড়া ধুমসো গোঁফ দেখা যাচ্ছে। সেই গোঁফের তলা থেকে আবার আওয়াজ এলো: হু-আর ইউ ?

হ্যাংচাদা বললে, আমি—মানে আমাকে চন্দ্রবদনবাবু ফিলিমে পার্ট করতে ডেকেছিলেন। এটাতে তো ইউরেকা ফিলিম ?

—ইউরেকা ফিলিম ?—গোঁফের তলা থেকে বিচ্ছিরি দাঁত বের করে কেমন খ্যাঁকখেঁকিয়ে হাসলো লোকটা। তারপর বললে, আলবৎ ইউরেকা ফিলিম্। পার্ট করবে ? ভেতরে চলে এসো।

—গেট যে বন্ধ। ঢুকবো কী করে ?

—পাঁচিল টপকে এসো। ফিলিমে নামবে আর পাঁচিল টপকাতে পারবে না, কী বলো ?

হ্যাংচাদা ভেবে দেখলে, কথাটা ঠিক। ফিলিমের কারবারই আলাদা। ছাখ্ না—বোঁ করে লোকে নল বেয়ে চারতলায় উঠে পড়ছে, ঝপাং করে পাঁচতলার থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ছে—একটা চলতি ট্রেন থেকে লাফিয়ে আর একটা ট্রেনে চলে যাচ্ছে। এসব না করতে পারলে ফিলিমে নামাবেই বা কেন ? হ্যাংচাদা বুঝতে পারলে, এখানে পাঁচিল টপকে ভেতরে যাওয়াই নিয়ম, ওইটেই প্রথম পরীক্ষা।

হ্যাংচাদা কী আর করে ? দেওয়ালের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে

উঠতে চেষ্টা করতে লাগলো। দু' পা ওঠে—আর সড়াৎ করে পিছলে পড়ে যায়। শখের সিল্কের পাঞ্জাবী ছিঁড়লো, গায়ের নুনছাল উঠে গেল, ঠিক নাকের ডগায় আবার কুট্টুস করে একটা কাঠপিঁপড়ে কামড়ে দিলে। ভেতরে বোধহয় আরো কিছু লোক জড়ো হয়েছে—তারা সমানে বলছে—হেঁইয়ো জোয়ান—আর একটু—আর একটু—

প্রাণ যায় যায়—কিন্তু প্যাংচাদা হার মানবার পাত্তর নয়। একে বাগবাজারের ছেলে, তায় জনতার দৃশ্যে পার্ট করতে এসেছে। আধঘণ্টা ধ্বস্তাধ্বস্তি করে ঠিক উঠে গেল পাঁচিলের ওপর। বসে একটু দম নিতে যাচ্ছে, অমনি তলা থেকে কারা বললে, আয় রে আয়—চলে আয় দাদা—আয় রে, আমার কুমড়োপটাশ—

আর বলেই প্যাংচাদার পা ধরে হ্যাঁচকা টান। প্যাংচাদা একেবারে ধপাস্ করে নিচে পড়লো। কুমড়োপটাশের মতোই।

কোমরে বেজায় চোট লেগেছিলো, বাপ-রে মা-রে বলতে বলতে প্যাংচাদা উঠে দাঁড়ালো। দেখলে পাঁচিলে ঘেরা মস্ত জায়গাটা—সামনে খানিক মাঠের মতো—একটু দূরে একটা বড়ো বাড়ি, পাশেই একটা ছোট ডোবা—তাতে জল নেই, খানিক কাদা। আর তার সামনে পাঁচ-সাতজন লোক দাঁড়িয়ে নানারকম মুখভঙ্গি করছে।

একজন একটা হুঁকো টানছে—তাতে কলকে-টলকে কিচ্ছুটি নেই। আর একজনের ছেঁড়া সাহেবী পোশাক—কিন্তু টুপির বদলে মাথায় একটা ভাঙা বালতি বসানো। একজনের গলায় ছেঁড়া জুতোর মালা। আর একজন—মুখে লম্বা লম্বা গোঁফ-দাড়ি—সমানে চেঁচিয়ে বলছে : 'কুকুর আসিয়া এমন কামড় দিলো পথিকের পায়।' বলেই সে এমন ভাবে ঘ্যাক্ করে দৌড়ে এলো যে, প্যাংচাদাকে কামড়ে দেয় আর কি!

সেই সাহেবী পোশাক পরা লোকটা ধাঁ করে রদ্দা মেরে 'কুকুর আসিয়া এমন কামড়'কে দূরে সরিয়ে দিলে। তারপর বললে—বন্ধুগণ, আমাদের নতুন অভিনেতা এসে গেছেন। বেশ চেহারাটি।

সকলে চেঁচিয়ে বললে, হিরো—আলবৎ হিরো।

প্যাংচাদা প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু হিরো শুনেই চাঙ্গা হয়ে উঠলো। বুঝলো, সিনেমায় তো নানারকম পার্ট করতে হয়—তাই ওরা সব ওইরকম সেজেছে, যাকে বলে 'মেক আপ।' তারপর তাকেই হিরো করতে চায়! প্যাংচাদা নাক আর কোমরের ব্যথা ভুলে একেবারে আকর্ণবিস্তৃত হাসি হাসলো। বললে, তা আজ্ঞে, হিরোর পার্টও আমি করতে পারবো—পাড়ার থিয়েটারে দু'বার আমি হনুমান সেজেছিলুম। কিন্তু চন্দ্রবদনবাবু কোথায়?

সেই জুতোর মালা-পরা লোকটা বললে, চন্দ্রবদন শ্বশুরবাড়ি গেছে—জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্ন খেতে। আমি হচ্ছি সূর্যবদন—ডিরেকটার!

বালতি মাথায় লোকটা তাকে ধাঁই করে এক চাঁটি দিলে: ইউ ব্লাডি নিগার! তুই ডিরেকটার কিরে? তুই তো একটা হুঁকোবর্দার। আমি হচ্ছি ডিরেকটার—আমার নাম হচ্ছে তারাবদন।

সূর্যবদন চাঁটি খেয়ে বিড়বিড় করতে লাগলো। আর যে-লোকটা কামড়াতে এসেছিলো, সে সমানে বলতে লাগলো:

"সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
আজি কি সুন্দর নিশি পূর্ণিমা উদয়
একা ননী পাড়ে ছানা আমগাছে চড়ে
মহৎ যে হয় তার সাধু ব্যবহার—"

তারাবদন ধমকে দিয়ে বললে, চুপ! এখন রিহার্সেল হবে। তারপর হিরোবাবু—তোমার নাম কি?

প্যাংচাদা বললে, আমার ভালো নাম বিষ্ণুচরণ—ডাক নাম প্যাংচা।

—প্যাংচা! আহা—খাসা নাম! শুনলেই খিদে পায়।—তারপর ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, জানো—আমার ডাক নাম চমচম!

প্যাংচাদা বলতে যাচ্ছে, তাই নাকি—হঠাৎ চমচম চেঁচিয়ে উঠলো: কোয়ায়েট! সব চুপ। রিহার্সেল হবে। মিস্টার প্যাংচা—

ন্যাংচাদা বললে, আজ্ঞে ?

—এক পা তুলে দাঁড়াও।

ন্যাংচাদা তাই করলে।

—এবার দু' পা তুলে দাঁড়াও।

ন্যাংচাদা ঘাবড়ে গিয়ে বললে, আজ্ঞে, দু' পা তুলে কি—

বলতেই তারাবদন চটাস্ করে একটা চাঁটি বসিয়ে দিলে ন্যাংচাদার গালে। বললে, রে বর্বর, স্তব্ধ করো মুখর ভাষণ! যা বলছি, তাই করো। ফিলিমে পার্ট করতে এসেছো—দু' পা তুলে দাঁড়াতে পারবে না! এয়ার্কী নাকি?

চাঁটি খেয়ে ন্যাংচাদার তো মাথা ঘুরে গেছে। কাঁউমাউ করে দু'পা তুলে দাঁড়াতে গেল। আর যেই দু' পা তুলতে গেছে, ধপাস্ করে পড়ে গেল মাটিতে।

সবাই চেঁচিয়ে উঠলো: শেম—শেম, পড়ে গেলি! ফাই—ফাই!

ন্যাংচাদা ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে গেল। ফিলিমে নামতে গেলে নিশ্চয় দু' পা তুলে দাঁড়াতে হয়—কিন্তু কী করে যে সেটা পারা যায় কিছুতেই ভেবে পেলো না।

তারাবদন ন্যাংচাদার জুল্‌পি ধরে এমন হ্যাঁচকা মারলো যে, তড়বড়িয়ে লাফিয়ে উঠতে হলো বেচারীকে। আরপর তারাবদন বললে, এবার গান করো।

—কী গান গাইবো?

—যে গান খুশি। বেশ উপদেশপূর্ণ গান।

ন্যাংচাদা একেবারে গাইতে পারে না···বুঝলি? মানে আমাদের প্যালার চাইতেও যাচ্ছেতাই গান গায়···একবার রাস্তায় যেতে যেতে এমন তান ছেড়েছিলো যে, শুনে একটা কাব্‌লীওলা আচম্‌কা আঁৎকে উঠে ড্রেনের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু হিরো হওয়ার আনন্দে সেই ন্যাংচাদাই ভীমসেনী গলায় গান ধরলো:

'ভুবন নামেতে ব্যাদ্‌ড়া বালক
তার ছিলো এক মাসী—
ভুবনের দোষ দেখে দেখিত না
সে মাসী সর্বনাশী—'

এইটুকু কেবল গেয়েছে···হঠাৎ সবাই চেঁচিয়ে উঠলো : স্টপ—তারাবদন বললে, না···আর গান না। এবার নাচো—

—নাচবো ?

—নিশ্চয় নাচবে।

—আমি তো নাচতে জানিনে।

—নাচতে জানো না···হিরো হতে এসেছো ? মামাবাড়ির আবদার পেয়েছো···না ? বলেই কড়াৎ করে হ্যাংচাদার জুল্‌পিতে আর এক টান।

গেলুম গেলুম···বলে হ্যাংচাদা নাচতে লাগলো। মানে ঠিক নাচ নয়···লাফাতে লাগলো ব্যথার চোটে।

সকলে বললে, এন্‌কোর···এন্‌কোর !

যেই এন্‌কোর বলা···অম্‌নি তারাবদন আর একটা পেল্লায় টান দিয়েছে হ্যাংচাদার জুল্‌পিতে ! 'পিসিমা গো গেছি'···বলে হ্যাংচাদা এবার এমন নাচতে লাগলো যে, তার কাছে কোথায় লাগে তোদের উদয়শংকর !

তারাবদন বললে, রাইট। ও-কে ! কাট্ !

কাট্ ! কাকে কাটবে ? হ্যাংচাদা ভয় পেয়ে থমকে গেছে। তারাবদন বললে, এবার তা হলে সন্তরণের দৃশ্য। কী বলো বন্ধুগণ ?

সঙ্গে সঙ্গে সকলে চেঁচিয়ে বললে, ঠিক···এবারে সন্তরণের দৃশ্য !

হ্যাংচাদা 'আরে আরে···করছো কি···' বলতে বলতে সবাই ওকে চ্যাংদোলা করে তুলে ফেললো। তারপর চক্ষের পলকে নিয়ে ছুঁড়ে ফেললে সেই ডোবাটার ভেতরে।

কাদা মেখে ভূত হয়ে উঠতে যাচ্ছে···সবাই আবার ঠেলে ডোবার মধ্যে ফেলে দিলে। বলতে লাগলো : সন্তরণ···সন্তরণ !

আর সন্তরণ! হ্যাংচাদার তখন প্রাণ যাওয়ার জো। সারা গা···জামাকাপড় কাদায় একাকার···নাকে মুখে দুর্গন্ধ—পচা পাঁক ঢুকে গেছে, আর বিছুটির মতো সে কি জ্বলুনি! হ্যাংচাদা যেমনি উঠতে চায় অমনি সবাই তক্ষুণি তাকে ডোবায় ফেলে দেয়। আর চ্যাঁচাতে থাকে : সন্তরণ···সন্তরণ—

শেষে হ্যাংচাদা আকাশ ফাটিয়ে হাহাকার করতে লাগলো···মানে 'হাহাকার' ফিলিমে পার্ট করতে এসেছিলো কিনা : বাঁচাও···বাঁচাও··· আমাকে মেরে ফেললে···আমি আর ফিলিমে পার্ট করবো না···

প্রাণ যখন যাবার দাখিল তখন কোত্থেকে তিন-চারজন খাকী শার্ট প্যাণ্ট্ পরা লোক লাঠি হাতে দৌড়ে এলো সেদিকে। আর তক্ষুণি তারাবদনের দল এক্কেবারে হাওয়া।

হ্যাংচাদার তখন প্রায় নাভিশ্বাস। খাকীপরা লোকগুলো তাকে পাঁক থেকে টেনে তুলে কিছুক্ষণ হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে রইলো। শেষে বললে, ক্যা তাজ্জব! ই নৌতুন পাগলা ফির কাঁহাসে আসলো ?

ব্যাপার বুঝলি ? আরে···ওটা মোটেই ফিলিম স্টুডিয়ো নয়··· লাম···মানে লুনাটিক অ্যাসাইলাম···অর্থাৎ কিনা পাগলা গারদ। উঁচু পাঁচিল আর 'লাম' দেখেই হ্যাংচাদা ঘাবড়ে গিয়েছিলো।

সেই থেকে হ্যাংচাদা নেংচে নেংচে হাঁটে···আর সিনেমা হল দেখলেই চোখ বুজে করুণ গলায় গাইতে থাকে : 'দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু···'

টেনিদা থামলো। আমার ঝালনুনের শিশি ততক্ষণে সাফ।

হাত চাটতে চাটতে বললে, তাই বলছিলুম, তোর গোবরবাবুকে বারণ করে দে। আরে—আসলে ফিলিম স্টুডিয়োগুলোও এমনি পাগলা গারদ···গোবরবাবুকে স্রেফ্ ঘুঁটেচন্দর বানিয়ে ছেড়ে দেবে !

তত্ত্বাবধান মানে—জীবে প্রেম!

রবিবারের সকালে, ডাক্তার মেজদা কাছাকাছি কোথাও নেই দেখে, আমি মেজদার স্টেথিস্কোপ কানে লাগিয়ে বাড়ির হুলো বেড়াল টুনির পেট পরীক্ষা করছিলুম। বেশ গুরগুর করে আওয়াজ হচ্ছে, মানে এতদিন ধরে যতগুলো নেংটি ইঁদুর, আরশোলা আর টিকটিকি খেয়েছে তারা ওর পেটের ভেতরে ডাকাডাকি করছে বলে মনে হচ্ছিলো। আমি টুনির পেট সম্পর্কে এইসব দারুণ দারুণ চিন্তা করছি, এমন সময় বাইরে থেকে টেনিদা ডাকলো : প্যালা, কুইক—কুইক!

স্টেথিস্কোপ রেখে এক লাফে বেরিয়ে এলুম বাড়ি থেকে।

—কী হয়েছে টেনিদা?

টেনিদা গম্ভীর হয়ে বললে···পুঁদিচ্চেরী!

মনে কোনোরকম উত্তেজনা এলেই টেনিদা ফরাসী ভাষায় কথা বলতে থাকে। তখন কে বলবে, স্রেফ্ ইংরিজির জন্যেই ওকে তিন-তিনবার স্কুল ফাইন্যালে আটকে যেতে হয়েছে!

আমি বললুম—পুঁদিচ্চেরী মানে?

—মানে, ব্যাপার অত্যন্ত সাংঘাতিক। এক্ষুণি তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। ক্যাবলা কিংবা হাবুল সেন কাউকে বাড়িতে পেলুম না—তাই তোকেই সঙ্গে নিয়ে যেতে এসেছি।

—কোথায় নিয়ে যাবে?

—কালীঘাটে।

—কালীঘাটে কেন?—আমি উৎসাহ বোধ করলুম : কোথাও খাওয়া-টাওয়ার ব্যবস্থা আছে বুঝি?

—এটার দিনরাত খালি খাওয়ার চিন্তা!—বলেই টেনিদা আমার

মাথার দিকে তাক্ করে চাঁটি তুললো, সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে তিন হাত দূরে ছিটকে গেলুম আমি।

—মারামারি কেন আবার? কী বলতে চাও, খুলেই বলো না।

চাঁটিটা কষাতে না পেরে ব্যাজার হয়ে টেনিদা বললে—বলতে আর দিচ্ছিস কোথায়···সমানে চামচিকের মতো চ্যাক্ চ্যাক্ করছিস তখন থেকে। হয়েছে কি জানিস, আমার পিসতুতো ভাই ভোম্বলদার ফ্ল্যাটটা একটু তত্ত্বাবধান···মানে সুপারভাইজ্ করে আসতে হবে।

—তোমার ভোম্বলদা কি? কম্বল গায়ে দিয়ে লম্বা হয়ে আছেন?

—আরে না-না। ভোম্বলদা···ভোম্বল বৌদি, মায় ভোম্বলদার মেয়ে ব্যাম্বি···সবাই মিলে ঝাঁসী না গোয়ালিয়র কোথায় যেন বেড়াতে গেছে। আজই সকালে সাড়ে দশটার গাড়িতে ওরা আসবে। এদিকে আমি তো স্রেফ্ ভুলে মেরে বসে আছি, বাড়ির কী যে হাল হয়েছে কিচ্ছু জানি না। চল্···দুজনে মিলে এইবেলা একটু সাফটাফ করে রাখি।

শুনে, পিত্তি জ্বলে গেল।···আমি তোমার ভোম্বলদার চাকর নাকি যে, ঘর ঝাঁট দিতে যাবো? তোমার ইচ্ছে হয়, তুমি যাও।

টেনিদা নরম গলায় আমাকে বোঝাতে লাগলো তখন।···ছি প্যালা, ওসব বলতে নেই···পাপ হয়। চাকরের কথা কেন বলছিস র‍্যা···এ হলো পরোপকার। মানে জীবসেবা। আর জানিস তো··· জীবে প্রেম করার মতো এমন ভালো কাজ আর কিচ্ছুটি নেই?

আমি মাথা নেড়ে বললুম···তোমার ভোম্বলদাকে প্রেম করে আমার লাভ কী? তার চেয়ে আমার হুলো বেড়াল টুনিই ভালো। সে ইঁদুর-টিঁদুর মারে।

টেনিদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে···কলেজে ভরতি হয়ে তুই পাখোয়াজ হয়ে গেছিস···ভারী ডাঁট হয়েছে তোর। আচ্ছা, চল্ আমার সঙ্গে···বিকেলে তোকে চাচার হোটেলে কাটলেট খাওয়াবো।

—সত্যি ?

—তিন সত্যি। কালীঘাটের মা-কালীর দিব্যি।

এরপরে জীবকে···মানে ভোম্বলদাকে প্রেম না করে আর থাকা যায় ? দারুণ উৎসাহের সঙ্গে আমি বললুম, আচ্ছা, চলো তা হলে।

বাড়িটা কালীঘাট পার্কের কাছেই। তেতলার ফ্ল্যাটে ভোম্বলদা থাকেন, আর তাঁদের তিন বছরের মেয়ে ব্যাম্বি থাকে।

টেনিদা চাবি খুলতে যাচ্ছিলো, আমি হাঁ হাঁ করে বাধা দিলুম। ···আরে, আরে কার ঘর খুলছো ? দেখছো না···নেম প্লেট্ রয়েছে অলকেশ ব্যানার্জী এম্, এস-সি ?

—ভোম্বলদার ভালো নামই তো অলকেশ।

শুনেই মন খারাপ হয়ে গেল। এমন নামটাই বরবাদ! ভোম্বলদার পোশাকী নাম দোলগোবিন্দ হওয়া উচিত, ভূতেশ্বর হতেও বাধা নেই, এমন কি করালীচরণও হতে পারে। কিন্তু অলকেশ একেবারেই বেমানান···তাহলে কিছুতেই ভোম্বলদা হওয়া উচিত নয়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একথা ভাবছি আর নাক চুলকোচ্ছি, হঠাৎ টেনিদা একটা হাঁক ছাড়লো।

—ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবি· নাকি হাঁ করে ? ভেতরে আয়।

ঢুকে পড়লুম ভেতরে।

গোছাবার সাজাবার কিছু নেই···সবই ভোম্বল বৌদি বেশ পরিপাটি করে রেখে গেছেন। দিব্যি বসবার ঘরটি·· আমি আরাম করে একটা সোফার ওপর বসে পড়লুম।

—এই, বসলি যে ?

—কী করবো, করবার তো কিছুই নেই।

—তা বটে।···টেনিদা হতাশ হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো একবার : ধুলো-টুলোও তো বিশেষ পড়েনি দেখছি।

—বন্ধ ঘরে ধুলো আসবে কোত্থেকে ?

—হুঁ, তাই দেখছি। কিছুক্ষণ নাক-টাক চুলকে টেনিদা বললে, কোনো উপকার না করে চলে গেলে মনটা যে বড্ড হু হু করবে র‍্যা! আচ্ছা—একটা কাজ করলে হয় না? ঘরে ধুলো না থাকলেও মেঝের এই কার্পেটটায় নিশ্চয় আছে। আর ধুলো থাকবে না অথচ কার্পেট থাকবে—এমন কখনোই হতে পারে না, এমন কোনোদিন হয় নি। আয়—ধর এটাকে—

কার্পেট ঝাড়বার প্রস্তাবটা আমার একেবারেই ভালো লাগলো না। আপত্তি করে বললুম—কার্পেট নিয়ে আবার টানাটানি কেন? ও যেমন আছে, তেমনি থাক না। খামোখা—

—শাট্ আপ। কাজ করবি নে তো মিথ্যেই ট্রাম ভাড়া দিয়ে তোকে কালীঘাটে নিয়ে এলুম নাকি? সোফায় বসে নবাবী করতে হবে না প্যালা, নেমে আয় বলছি—

অগত্যা নামতে হলো, সোফা আর টেবিল সরাতে হলো, কার্পেট টেনে তুলতে হলো, তারপর একবার—মাত্র একটিবার ঝাড়া দিতেই—ডিলা গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস!

ঘরের ভেতরে যেন ঘূর্ণি উঠলো। চোখের পলকে অন্ধকার!

টালা থেকে ট্যাংরা আর শেয়ালদা থেকে শিয়াখালা পর্যন্ত যত ধুলো ছিলো এক সঙ্গে পাক খেয়ে উঠলো। 'সেরেছে সেরেছে' বলে এক বাঘা চিৎকার দিলুম আমি, তারপর ছু লাফে আমরা বেরিয়ে পড়লুম ঘর থেকে—নাকে ধুলো, কানে ধুলো, মুখে ধুলো, মাথায় ধুলো! পুরো দশটি মিনিট খক্ খক্ খকাখক করে কাশির প্রতিযোগীতা! এর মধ্যে আবার কোত্থেকে গোটা দুই আরশোলা আমার নাকের ওপর ডিগবাজি খেয়েও গেল!

কাশি বন্ধ হলে, মাথা-টাথা ঝেড়ে, মুখভরতি কিচকিচে বালি নিয়ে আমি বললুম, এটা কী হলো, টেনিদা?

টেনিদা গাঁ গাঁ করে বললো, হুঁ, কেমন বেয়াড়া হয়ে গেল রে!

মানে এত ধুলো যে ওর ভেতরে থাকতে পারে—বোঝাই যায়নি! ইস্—ঘরটার অবস্থা দেখছিস?

হ্যাঁ—দেখবার মতো চেহারাই হয়েছে এবার। দরজা দিয়ে তখনো ধোঁয়ার মতো ধুলো বেরুচ্ছে—সোফা, টেবিল, টিপয়, বুককেস, রেডিয়ো—সব কিছুর ওপর নেট তিন ইঞ্চি করে ধুলোর আস্তর! ভোম্বল বৌদি ঘরে পা দিয়েই স্রেফ্ অজ্ঞান হয়ে পড়বেন।

দু হাতে মাথা চুলকোতে চুলকোতে টেনিদা বললে, ইঃ—একেবারে নাইয়ে দিয়েছে রে!

আমি বললুম, ভালোই তো হলো। কাজ করতে চাইছিলে, করো এবার প্রাণ খুলে। সারা দিন ধরেই ঝাঁট দিতে থাকো।

দাঁত খিঁচোতে গিয়েই বালির কিচকিচানিতে টেনিদা খপাৎ করে মুখ বন্ধ করে ফেললো।

—তা, ঝাঁট তো দিতেই হবে। বাড়িতে এসে এই দশা দেখবে নাকি ভোম্বলদা? আয়—

—আবার ঝাড়তে হবে কার্পেট?

—নিকুচি করেছে কার্পেটের। চল্—ঝাঁটা খুঁজে বের করি।

ঝাঁটা আর পাওয়া যায় না। বসবার ঘরে নয়—শোয়ার ঘরে নয়, শেষ পর্যন্ত রান্নাঘরে এসে হাজির হলুম আমরা।

আরে—ওই তো ঝাঁটা!

তার আগেই জাল দেওয়া মীট্সেফের দিকে নজর পড়েছে আমার।

—টেনিদা!

—কী হলো আবার?—টেনিদা খ্যাঁক-খ্যাঁক করে বললো, সারা ঘর ধুলোয় একাকার হয়ে রয়েছে—এখন আবার ডাকাডাকি কেন? আয় শীগগির—একটু পরেই তো ওরা এসে পড়বে!

—আমি বলছিলুম কি—কান দুটো একবার চুলকে নিয়ে জবাব দিলুম: মীট্সেফের ভেতর যেন গোটা তিনেক ডিম দেখা যাচ্ছে।

—তাতে কী হলো ?

—একটা মাখনের টিনও দেখতে পাচ্ছি।

টেনিদার মনোযোগ আকৃষ্ট হলো।

—আচ্ছা, বলে যা।

—দুটো কেরোসিন স্টোভ দেখতে পাচ্ছি—দু বোতল তেল দেখা যাচ্ছে—ওখানে শেলফের ওপর একটা দেশলাইও যেন চোখে পড়ছে।

—হুঁ, তারপর ?

আমি ওয়াশ বেসিনটা খুললুম।

—এতেও জল আছে—দেখতে পাচ্ছো তো ?

—সবই দেখতে পাচ্ছি। তারপর ?

আমি আর একবার বাঁ কানটা বেশ করে চুলকে নিলুম : মানে সামনে এখন অনেক কাজ—যাকে বলে দুরূহ কর্তব্য ! ঘর থেকে ওই মণ খানেক ধুলো ঝেঁটিয়ে বের করতে ঘণ্টাখানেক তো মেহনত করতে হবে অন্তত ? আমি বলছিলুম কি, তার আগে একটু কিছু খেয়ে নিলে হয় না ? ধরো তিনটে ডিম দিয়ে বেশ বড়ো বড়ো দুটো ওম্‌লেট্ হতে পারে—

—ব্যস-ব্যস—আর বলতে হবে না !—টেনিদার জিভ থেকে শড়াক করে একটা আওয়াজ বেরুলো : এটা মন্দ বলিস্‌নি। পেট খুশি থাকলে মেজাজটাও খুশি থাকে। আরে—এই যে একটা বিস্কুটের টিনও দেখতে পাচ্ছি—

পত্রপাঠ টিনটা টেনে নামালো টেনিদা, কিন্তু খুলেই মুখটাকে গাজরের হালুয়ার মতো করে বললো, ধ্যেৎ !

—কী হলো, বিস্কুট নেই ?

—নাঃ, কতকগুলো ডালের বড়ি ! ছ্যা-ছ্যা !—টেনিদা ব্যাজার হয়ে বললো, জানিস—ভোম্বল বৌদি এম-এ পাস, অথচ বিস্কুটের টিনে ডালের বড়ি রাখে। রামোঃ !

আমি বললুম, তাতে কী হয়েছে ? আমার এলাহাবাদের সোনা দি-ও তো কী সব থীসিস্ লিখে ডাক্তার হয়েছে—সে-ও তো ডালের বড়ি খেতে খুব ভালোবাসে !

—রেখে দে তোর সোনা দি !—টেনিদা ঠক্ করে বড়ির টিনটাকে একপাশে ঠেলে দিয়ে বললে, বলি, মৎলব কী তোর ? খালি তর্কোই করবি আমার সঙ্গে, না ওম্‌লেট্ টোম্‌লেট ভাজবি ?

—আচ্ছা, এসো তা হলে, লেগে পড়া যাক।

লাগতে দেরি হলো না। সস্‌প্যান বেরুলো, ডিম বেরুলো, চামচে বেরুলো, লবণ বেরুলো, লঙ্কার গুঁড়োও পাওয়া গেল খানিকটা। শুধু গোটা দুই পেঁয়াজ পাওয়া গেলেই আর দুঃখ থাকতো না।

টেনিদা বললো—ডি-লা গ্র্যাণ্ডি ! আরে, ওতেই হবে। তুই ডিম তিনটে ফেটিয়ে ক্যাল্—আমি স্টোভ ধরাচ্ছি ততক্ষণে।

ওম্‌লেট্ বরাবর খেয়েই এসেছি, কিন্তু কী করে যে ফেটাতে হয়, সেটা কিছুতেই মনে করতে পারলুম না। নাকি ফোটাতে বলছে ? তা হলে তো তা দিতে হয়। কিন্তু তা দিতে থাকলে ও কি আর ডিম থাকবে ? তখন তো বাচ্চা বেরিয়ে আসবে। আর বাচ্চা বেরিয়ে এলে আর ওম্‌লেট্ খাওয়া যাবে না—তখন চিকেন কারী রান্না করতে হবে। আর তা হলে—

টেনিদা বললো—অমন টিকটিকির মতো মুখ করে বসে আছিস কেন রা ? তোকে ডিম ফেটাতে বললুম না ?

—ফেটাতে বলছো ? মানে ফাটাতে হবে ? নাকি ফোটাতে বলছো ? ফোটাতে আমি পারবো না সাফ বলে দিচ্ছি তোমাকে।

—কী জ্বালা !—টেনিদা খেঁকিয়ে উঠলো : কোনো কাজের নয় এই হতচ্ছাড়াটা—খালি খেতেই জানে। ডিম কী করে ফেটাতে হয়, তা-ও বলে দিতে হবে ? গোড়াতে মুখগুলো একটু ভেঙে নে—তারপর পেয়ালায় ঢেলে চামচে দিয়ে বেশ করে নাড়তে থাক। বুঝেছিস ?

আরে তাই তো! এতক্ষণে মালুম হলো আমার। আমাদের পটলডাঙার 'দি গ্রেট্‌ আবার খাবো রেস্তোরাঁ'র বয় কেষ্টাকে অনেকবার কাচের গেলাসে ডিমের গোলা মেশাতে দেখেছি বটে।

পয়লা ডিমটা ভাঙতেই একটা বিচ্ছিরি বদ গন্ধে সারা ঘর ভরে উঠলো। দোস্‌রা ডিম থেকেও সেই খোশবু!

নাক টিপে বললুম, টেনিদা—যাচ্ছেতাই গন্ধ বেরুচ্ছে কিন্তু!

টেনিদা স্টোভে তেল ভরতে ভরতে বললো—ডিম থেকে কবে আবার গোলাপ ফুলের গন্ধ বেরোয়? নাকি ডিম ভাঙলে তা থেকে হালুয়ার সুবাস বেরুবে? নে—নিজের কাজ করে যা।

—পচা বলে মনে হচ্ছে আমার।

—তোমার মাথার ঘিলুগুলোই পচে গেছে—টেনিদা চটে বললে, একটা ভালো কাজের গোড়াতেই তুই বাগড়া দিবি! নে—হাত চালা। ইচ্ছে না হয় খাস্‌নি—আমি যা পারি ম্যানেজ করি!

—করো, তুমিই করো তবে—বলে যেই তেস্‌রা নম্বর ডিম মেজেতে ঠুকেছি—

গল গল করে ভেতর থেকে যে বস্তু বেরিয়ে এলো, তার যে কী নাম দেবো তা আমি আজো জানি না। আর গন্ধ! মনে হলো দুনিয়ার সমস্ত বিকট বদগন্ধকে কে যেন ওর মধ্যে ঠেসে রেখেছিলো—একেবারে বোমার মতো ফেটে বেরিয়ে এলো তারা! মনে হলো, এক্ষুণি আমার দম আটকে যাবে!

গেছি—গেছি—বলে আমি একদম ঠিকরে পড়লুম বাইরে। সেই দুর্ধর্ষ মারাত্মক গন্ধের ধাক্কায় বোঁ করে যেন মাথাটা ঘুরে গেল আর আমি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়লুম শিবনেত্র হয়ে।

—উঁরে ব্বাঁপ—ই কিঁ গন্ধঁ র‍্যাঁ!—টেনিদার একটা আর্তনাদ শোনা গেল। তারপর—

এবং তারপরেই—

টেনিদাও খুব সম্ভব একটা লাফ মেরেছিলো, এবং পেল্লায় লাফ ! পায়ের ধাক্কায় জ্বলন্ত কেরোসিন স্টোভটা তেল ছড়াতে ছড়াতে বলের মতো গড়িয়ে এলো—সোজা গিয়ে হাজির হলো ভোম্বলদার শোবার ঘরের দরজার সামনে, আর ভোম্বল বৌদির সাধের সম্বলপুরী পর্দা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো তৎক্ষণাৎ !

টেনিদা বললো, আগুন—আগুন—ফায়ার ব্রিগ্রেড্—বসবার ঘরে টেলিফোন আছে প্যালা—দৌড়ে যা—জিরো ডায়েল্—ফায়ার—

উর্ধ্বশ্বাসে ফোন করতে ঢুকেছি, সেই স্তূপাকার কার্পেটে পা আটকে গেল ! হাতে টেলিফোনও তুলেছিলুম, সেইটে সুদ্ধুই ধপাস করে রাম আছাড় খেলুম একটা। ক্র্যাং—কড়াৎ করে আওয়াজ উঠলো, টেলিফোনের মাউথপিস্টা সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে দু-টুকরো ! যাক্—নিশ্চিন্দি ! ফায়ার ব্রিগেডকে আর ডাকতে হলো না !

উঠে বসবার আগেই ঝপাস-ঝপাস !

টেনিদা দৌড়ে বাথরুমে ঢুকেছে, আরো দু বালতি পনেরো দিনের পচা জল চৌবাচ্চা থেকে তুলে এনে ছুঁড়ে দিয়েছে সম্বলপুরী পর্দার ওপর। আধখানা পর্দা পুড়িয়ে আগুন নিভেছে, কিন্তু শোবার ঘরে জলের ঢেউ খেলছে···বিছানাপত্র ভিজে একাকার, খানিকটা জল ছল্‌কে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলটাকেও সাফসুফ করে দিয়েছে একবারে !

নিজেদের কীর্তির দিকে তাকিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলুম আমরা। বাড়িভরতি পচা ডিম আর পোড়া কাপড়ের গন্ধ···বসবার ঘরে দু-ইঞ্চি ধুলোর আস্তর—শোবার ঘর আর বারান্দা জলে থই-থই—আধ পোড়া পর্দাটা থেকে জল চুঁইয়ে পড়ছে, টেলিফোনটা ভেঙে চুরমার !

একেই বলে বাড়ি সুপারভাইজ করা···এর নামই জীবে প্রেম !

ঠিক তখনই নীচে থেকে ট্যাক্সির হর্ণ উঠলো···ভ্যাঁ—ভ্যাঁপ্‌প্ !

টেনিদা নড়ে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে মাথা সাফ হয়ে গেছে ওর। চিরকালই দেখে আসছি এটা।

—প্যালা, কুইক্ !

কিসের কুইক্ সে-কথাও কি বলতে হবে আর ? আমি পটলডাঙার ছেলে—ট্যাক্সির হর্ণ শুনেই বুঝতে পেরেছি সব। সিঁড়ি দিয়ে তো নামলুম না—যেন উড়ে পড়লুম রাস্তায় !

ট্যাক্সি থেকে ভোম্বলদা নামছেন, ভোম্বল বৌদি নামছেন, ভোম্বলদার ছোকরা চাকর জলধরের কোলে ব্যাম্বি নামছে।

ভোম্বলদা চেঁচিয়ে উঠলেন।—কিরে টেনি, বাড়িঘর সব—

—সব ঠিক আছে ভোম্বলদা—একেবারে ছবির মতো সাজিয়ে দিয়ে এসেছি!—বলেই টেনিদা চাবির গোছাটা ছুঁড়ে দিলে ভোম্বলদার দিকে। তারপর হতভম্ব ভোম্বলদা একটা কথা বলবার আগেই দুজনে দু লাফে একটা দু নম্বরের চলতি বাসের ওপর।

আর দাঁড়ানো চলে এরপর ? এক সেকেণ্ডও ?

ঘণ্টাদার কাবলু কাকা

ঘণ্টাদা বললে, ভীষণ প্যাঁচে পড়ে গেছি রে, প্যালা। চোখে শর্ষের ফুল দেখছি আমি।

—কী হলো তোমার? শর্ষের চাষ করছো নাকি আজকাল?—আমি উৎসাহিত হয়ে বললুম, তোমার অসাধ্য কাজ নেই। তুমি পাটের দালালী করেছো, ঝোলা গুড়ের ব্যবসা করেছো, সিনেমায় জনতার দৃশ্যে অভিনয় করেছো—বাজী রেখে কাঁচা ডিম খেতে গিয়ে বমি করেছো, পোড়ো বাড়ীতে ভূত দেখতে গিয়ে ভির্মি খেয়েছো। শেষকালে কি শর্ষের চাষ আরম্ভ করে দিলে?

—থাম, মেলা বকিস নি!—নাকটাকে পান্তুয়ার মতো করে ঘণ্টাদা বললে, আমি মরছি নিজের জ্বালায়—উনি ইদিকে এলেন ইয়ার্কি দিতে। হয়েছে কী, জানিস? আজই খবর পেলুম, বিকেলের গাড়ীতে কাশীর কাবলু কাকা আসছেন।

—সে তো খুবই ভালো কথা!—আমি আরো উৎসাহ বোধ করলুম: কাশী থেকে যখন আসছেন তখন নিশ্চয়ই কিছু চম্‌চম্ আর গজা নিয়ে আসছেন। আমিও খাবো, বিকেলে।

সে গুড়ে বালি, বুঝলি—সে 'জ্যানারিতে' শ্রেফ্ 'স্যাণ্ড'।—ঘণ্টাদা কথাটার ইংরেজি অনুবাদ করে দিলে: কাশী থেকে গজা চম্‌চম্ নিশ্চয়ই আনবেন, কিন্তু সে আর হাওড়া পর্যন্ত পৌঁছুবে না। মোগল সরাইয়ের আগেই কাবলু কাকা ওগুলোকে সাবাড় করে ফেলবেন! ...গলা নামিয়ে ঘণ্টাদা বললে, কাবলু কাকা ভীষণ খেতে ভালোবাসেন, জানিস? একটা আস্ত পাঁঠা খেয়ে নেন একবারে।

—ল্যাজ-ট্যাজ শিং-টিং সুদ্ধু?—আমি জানতে চাইলুম।

—চুপ কর্—বাজে বকিস নি।···আমাকে একটা ধমক দিয়ে ঘণ্টাদা বললে, তা কথাটা যে একেবারে মন্দ বলেছিস তা-ও নয়। কাবলু কাকা যা খাদক—পাঁটার শিং তো দূরে থাক, বেঁধে দিলে গলার দড়িগাছটাও খান বোধ হয়। বিশ্বখাদক, বুঝলি প্যালা—বিশ্বখাদক! তিন দিন থাকবেন। আর এই তিন দিনের মধ্যে আমাকেও খেয়ে যাবেন—এই তোকে বলে দিলুম।

সত্যি বলতে কি, কথাটা বিশ্বাস হলো না। ঘণ্টাদার মতো অখাদ্য জীব আমি দেখিনি। কালোবাজার করে বেশ টাকা জমিয়েছে, কিন্তু একটা পয়সা খরচ করবে না। পাড়ার ছেলেরা একটা ভালো কাজে চাঁদা চাইতে গেলে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে। বাজারে গিয়ে মরা মাছ কুড়িয়ে আনে···সস্তায় কেনে পচা আলু। কাবলু কাকা যতো দিক্‌পাল খাইয়েই হোক, ঘণ্টাদাকে খাওয়া তার পক্ষেও সম্ভব নয়!

ঘণ্টাদা একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

—যাই দেখি, বাজারে। সের দুই মাংস, সের তিনেক মাছ আর সের খানেক ঘি কিনে আনিগে। এই তিন দিনে যদি আমার দুশো টাকা খসিয়ে না যান, তা হলে আমার নামে কুকুর পুষিস, প্যালা।

—তোমার নামে কুকুর পুষলে লজ্জায় সে বেচারা সুইসাইড্ করবে —আমি মনে মনে বললুম। তারপর জিজ্ঞাসা করলুম, তা, তোমারই বা হলো কী, ঘণ্টাদা? তুমিই বা খামোখা কাবলু কাকার জন্যে এতো অপব্যয় করছো কেন?

—আরে, করছি কি সাধে। কাবলু কাকার ছেলেপুলে নেই —বিষয় সম্পত্তিও অঢেল। যদি উইল-টুইল করবার সময়—!

আমি মাথা নাড়লুম: বিলক্ষণ!

—তবে, এই তিন দিনেই আমাকে আদ্ধেক মেরে রেখে যাবেন। এমন করে খেয়ে যাবেন যে, আমার হার্টফেল হওয়াও অসম্ভব নয়। তখন কাবলু কাকার সম্পত্তি পেলেই কি আর না পেলেই বা কি।—

রাস্তায় একটা কাকের পালক পড়ে ছিলো, সেটা তুলে নিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে ঘন্টাদা বললে, তা আমিও একটা প্যাঁচ কষেছি, বুঝলি—? আমার বাড়ীতে একখানা ঘোরতর ফিতের খাটিয়া আছে। তাতে অন্ততঃ দু'কোটি ছারপোকার বাস। তাইতেই কাবলু কাকাকে শুতে দেবো। তারপর—

—তারপর যদি চটে গিয়ে উইল-টুইল বদলে ফেলে—তখন?

—না—না, কাশীর লোক, অতো ঘোর-প্যাঁচ বুঝবেন না। খেতে পেলেই খুশি। এদিকে আমি ভুরি-ভোজের ব্যবস্থা করবো। খেয়ে কাবলু কাকা মশগুল হয়ে যাবেন—আবার ছারপোকার কামড়ে জেরবার হয়ে পালাতেও পথ পাবে না—অ্যা?

—তা বটে—তা বটে!—ভেবেচিন্তে আমি মাথা নাড়লুম।

সেই কাকের পালকটা দিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে ঘন্টাদা বাজারে চলে গেল।

আমার দুর্দান্ত কৌতূহল হলো। সেদিন সন্ধ্যেবেলাতেই আমি সেই রোমাঞ্চকর কাবলু কাকাকে দেখতে গেলুম।

দোরগোড়ায় আলুর দমের মতো মুখ করে ঘন্টাদা দাঁড়িয়েছিলো। ঘরের ভেতরে আঙুল বাড়িয়ে বললে, ওই ভাখ্। মানুষ নয় প্যালা, —মানুষ নয়। সাক্ষাৎ বক-রাক্ষস।

বক-রাক্ষসটাকে দেখবার জন্যে আমি ঘরে পা দিলুম। একটা টেবিলের ওপরে প্রকাণ্ড একটা বারকোস দেখা গেল, আর তার ওপর দেখা গেল শ'খানেক লুচি। আর কিছু না।

হঠাৎ লুচির স্তূপের ওপাশ থেকে প্রকাণ্ড একখানা হাত বেরিয়ে এসে খান দশেক আন্দাজ একসঙ্গে তুলে নিলে। খচ খচ করে লুচি চিবোবার আওয়াজ পাওয়া গেল···কিন্তু তবু কাউকে দেখতে পাচ্ছি না ভৌতিক কাণ্ড নাকি?

আবার সেই প্রকাণ্ড হাতখানার আবির্ভাব এবং খান পনেরো

লুচির তিরোধান। তারপর লুচির পাহাড়টা একটু নিচের দিকে নামতে কাবলু কাকাকে দেখা গেল।

বাপ্...কী চেহারা! ওজন বোধহয় মন চারেক হবে। মুখখানা একেবারে ঢাকাই জালা। চেহারা দেখে মনে হলো, একটা আস্ত পাঁঠা তো তুচ্ছ ব্যাপার...নগদ একটা ঘোড়া খাওয়াও অসম্ভব নয়, কাবলু কাকার পক্ষে।

কিন্তু চেহারা অমন জগঝম্প হলে কী হয়...লোকটির মেজাজ ভালো। আমাকে দেখে একগাল হাসলেন।

...তুমি আবার কে হে? কোথায় থাকো?

আমার হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিলো। কাবলু কাকার হাসি দেখে কেমন সাহস এলো গায়ে। বললুম, আমার নাম প্যালারাম বাঁড়ুয্যে, আমি পটলডাঙায় থাকি।

ততক্ষণে ছোলার ডালের মতো মুখ করে ঘণ্টাদা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দেখছে লুচির পরমাগতি। ওর একটা বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাসও আমি শুনতে পেলুম।

কাবলু কাকা থাবা দিয়ে আধ সেরটাক কুমড়োর ছক্কা মুখে তুললেন। ঘণ্টাদার মুখটাও কুঁচ্‌কে-টুঁচ্‌কে প্রায় কুমড়োর ছক্কার মতো হয়ে গেল।

কাবলু কাকা ভরা মুখে বললেন, তুমি এতো রোগা কেন?

...আজ্ঞে পালা জ্বরে ভুগি, আর বাসক পাতার রস খাই—

—আরে দূর—দূর—পালা জ্বর। জুৎ মতো খেতে জানলে ও পালা জ্বর ল্যাজ তুলে পালাবে। শোনো, এক কাজ করবে। সকালে উঠে চা খাও? খেয়ো না আর। ওতে কোনো ফুড-ভ্যালু নেই—অনর্থক শরীর নষ্ট। তারচেয়ে ভোরে উঠেই একপো খাঁটি গাওয়া ঘি চোঁ চোঁ করে খেয়ে নেবে।

—এক পোয়া খাঁটি গাওয়া ঘি!—আমার চোখ কপালে চড়লো।

—এ আর বেশি কি ? আমি তো আধসের করে খাই। ওরে ঘণ্টা, আমার ঘিয়ের ব্যবস্থা করে রাখিস, কাল। মনে থাকবে ?

ঘণ্টাদা মাথা নাড়লো। মনে থাকবে মানে ? সারারাত বেচারার ঘুম হলে হয়।

—আর শোনো, দুবেলা দুটো করে মুরগীর রোস্ট্—সেরটাক দাদখানি চালের ভাত—আর দু সের করে দুধ খাবে। তুমি ছেলে-মানুষ—তাই লঘু পথ্য দিলুম। আমি ছ'টা করে মুরগী খাই, তিন সের চালের ভাত লাগে আর ছ'সের করে দুধ খেয়ে থাকি। ঘণ্টা, মনে থাকবে তো ?

ঘণ্টাদার হাত-পা কাঁপছিলো। গলা দিয়ে কেমন একটা আওয়াজ বেরুলো তার। ওর হয়ে আমিই জবাব দিলুম: নিশ্চয় থাকবে। হাজারবার থাকবে। ঘণ্টাদার মেমারি খুব ভালো।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে ঘণ্টাদা ধরা গলায় আমায় বললে—কি রকম বুঝছিস্, প্যালা ?

—সঙ্গীন।

—খাওয়ার যা লিষ্টি দিচ্ছে, জগুবাবুর বাজারে কুলুবে না—গড়িয়া মার্কেটে যেতে হবে। এই তিন দিনেই আমি ফতুর হবো, প্যালা—আমায় রাস্তায় দাঁড়াতে হবে।

ইচ্ছে হলো বলি, কালোবাজারী করে কয়েক লাখ টাকা তুমি জমিয়েছো, কাবলু কাকাই হচ্ছে তোমার আসল দাওয়াই। কিন্তু অনর্থক ঝগড়া করে কি হবে ?

ঘণ্টাদা মুড়িঘণ্টর মতো মুখ করে বললে, তবে সেই দুর্ধর্ষ খাটখানা আছে, আর দুর্ধর্ষ ছারপোকা আছে। এখন ওরা যদি ম্যানেজ করতে পারে—তবেই।

—হ্যাঁ, আপাততঃ ওরাই তোমার ভরসা। বলে ঘণ্টাদার কাছ থেকে আমি বিদায় নিলুম।

সকালে উঠে সবে লজিকের বই খুলে বসেছি। কী যে মুশ্‌কিল—ওই 'বার্‌বারা সিলোরেণ্ট্‌' আমার কিছুতেই মনে থাকে না।

হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে—ঘণ্টাদা।

ঘণ্টাদার মুখখানা তখন ডিমের কারীর মতো হয়ে গেছে। কেঁদে ঘণ্টাদা বললে—প্যালা, সর্বনাশ হয়েছে। এবার আমার ফাঁসি হবে।

—বলো কি? খাওয়ার বহর দেখে রেগে-মেগে তুমি কাবলু কাকাকে খুন করে ফেলেছো নাকি?

—জানিস তো, আমি একটা আরশোলাও মারতে পারিনে।

—তাহলে খামোখা তোমার ফাঁসি হবে কেন?

—বরাত প্যালা—স্রেফ্‌ বরাত। কাবলু কাকা মারা গেছেন।

—অ্যাঁ!

—তা ছাড়া কী আর? ওই দু' কোটি ছারপোকা, জানিস তো? ওদের হাতে কারুর রক্ষা আছে? নির্ঘাৎ ওদের কামড়ে কাবলু কাকা পটল তুলে বসেছেন। এই ছাখ্‌না—সকাল থেকে দু ঘণ্টা দরজায় ধাক্কা দিয়েছি, জানলার ফাঁক দিয়ে পিচ্‌কিরি করে বরফ জল দিয়েছি গায়ে, তবু নট্‌ নড়ন-চড়ন, কিস্‌সু না।

—তবে পুলিশে খবর দাও!

—পুলিশ! ওরে বাবা! এমনিতেই ওরা দু বার আমার বাড়ী সার্চ করেছে, আমি নাকি চায়ের সঙ্গে চামড়ার কুচো মেশাই। এখনো ধরতে কিছু পারে নি বটে, কিন্তু নেক নজরটা তো আছে। নির্ঘাৎ বলবে, চক্রান্ত করে এই ভয়ঙ্কর খাটিয়ায় শুইয়ে আমি কাবলু কাকাকে খুন করিয়েছি। তখন ফাঁসি না হোক—বিশ বছর জেল আমার ঠেকায় কে!

তোমাকে জেলে রাখলে দুনিয়ার অনেক উপকার হবে—আমি মনে মনে বললুম। মুখে সাহস দিয়ে বললুম—চলো দেখি, যাই একবার। বুঝে আসি ব্যাপারটা।

—যেতে যে আমার পা সরছে না, প্যালা।

—তবু যেতেই হবে।—আমি কঠোর হয়ে বললুম—সেই ভয়াবহ খাটে শোয়াবার সময় মনে ছিলো না? চলো বলছি—আমি প্রায় জোর করে ঘণ্টাদাকে টেনে নিয়ে গেলুম।

কিন্তু বসবার ঘরে ঢুকে আমরা ভূত দেখলুম।

ভূত নয়—সশরীরে কাবলু কাকা বসে। সামনে একটা কাচের গ্লাস—তাতে আধ সের আন্দাজ গাওয়া ঘি। একটু একটু করে পরম আরামে চুমুক দিচ্ছেন কাবলু কাকা।

আমাদের দেখেই তিনি হাসলেন। বললেন, এই যে ঘণ্টা—কোথায় গিয়েছিলি? আঃ—কাল রাতে যা ঘুমিয়েছি—অপার। তাই উঠতে আজ একটু দেরীই হয়ে গেল।

ঘণ্টাদা একবার হাঁ করলো। কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরুলো না তার।

কাবলু কাকা ঘিয়ের গেলাসে চুমুক দিয়ে বললেন—চর্বি একটু বেশি হয়েছে শরীরে—রাত্তিরে তাই ভালো ঘুম হয় না। কেমন গা জ্বালা করে। কিন্তু কাল সারারাত কারা যেন মোলায়েম ভাবে গা চুলকে দিয়েছে। সে কি আরাম! এক বছরের মধ্যেও আমার এমন নিটোল ঘুম হয়নি। তাই উঠতে একটু দেরীই হয়ে গেল আজ। আমি ভাবছি কি—জানিস ঘণ্টা? তিন দিন কেন—মাস-খানেকই থেকে যাবো তোর এখানে।

হঠাৎ গোঁ গোঁ করে আওয়াজ। ঘণ্টাদা পপাত-ধরণীতলে।

—কী হলো? ঘণ্টার আবার মৃগী আছে নাকি?

আমি বললুম—মৃগী নয়। আপনি একমাস ওর কাছে থাকবেন জেনে আনন্দে মূর্ছা গেছে।

ছোটদের

ভালো ভালো গল্প

যাঁদের বই এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় * অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত * শিবরাম চক্রবর্তী * বনফুল * হেমেন্দ্রকুমার রায় * শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় * সুকুমার দে সরকার * বুদ্ধদেব বসু * লীলা মজুমদার * আশাপূর্ণা দেবী * প্রেমাঙ্কুর আতর্থী * শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রতিটি দুই টাকা।

পত্রে জানালে পূর্ণ তালিকা পাঠানো হয়।